বাংলার সাধনা

ক্ষিতিমোহন সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

আষাঢ় ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

নিবেদন

পৃথিবীতে মানুষ অসংখ্য। অথচ প্রত্যেকটি মানুষের চলায়-বলায় ও আকারে-প্রকারে এক-এক বিশেষ রকমের ব্যঞ্জনা। তাই প্রত্যেকটি মানুষকে আমাদের ভাষায় বলে ব্যক্তি। জনে জনে ব্যক্তিত্বের এই বৈচিত্র্য। শুধু কণ্ঠস্বরেও ব্যক্তিটিকে চেনা যায়। পদধ্বনিতেও প্রত্যেকটি মানুষের এই বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা সব সময়ে ধরতে না পারলেও দৃষ্টিহীনদের কানে তা ধরা পড়ে। এই সব কথা নিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা আলোচনা চলছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানমূর্তি ব্রজেন্দ্র শীল এই দুইজনের মধ্যে। আমরা দুইএকজন ভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

মানবতত্ত্বসম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের একটি গভীর আলোচনার পরে কবিগুরু বলছিলেন, "আমাদের দেশে সব কথাতেই স্থান-কাল-পাত্রের বিচার। এর মধ্যে মানুষই হল পাত্র। প্রত্যেকটি পাত্রেরই আপন আপন বিশেষত্ব আছে। বিশেষ বিশেষ স্থান ও কালেরও কি এইরূপ এক-একটি বিশেষত্ব নেই? আমার তো মনে হয় এক যুগ অন্য যুগ হতে রীতিমত বিভিন্ন। বিচার করে দেখলে পৃথিবীর সর্বদেশেই সেই-সেই যুগের কালগত একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। আবার প্রত্যেকটি যুগেরও দেখা যায় দেশগত একটি বিলক্ষণতা। নতুন পুরাতন সব যুগেই সেই দেশের সেই বৈশিষ্ট্যটিকে এড়িয়ে যাবার জো নেই।"

ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মতে ভারতের এই বৈশিষ্ট্যটি কি?"

কবিগুরু বললেন, "বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনাই ভারতের বিশেষ ধর্ম। আমার 'ভারতের ইতিহাসের ধারা'তে আমি একথা ভাল করেই বলেছি। ভারতের উঁচু নিচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে। কেউ কাউকে নিঃশেষ করতে চায় নি। এইটি আর কোথাও কি দেখা যায়? আর সব দেশেই প্রবল ধর্ম ও সংস্কৃতি দুর্বলকে পিষে মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ভারতে কিন্তু সেটি কখনোই ঘটে নি। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে স্বরসংগতির (harmonyর) সাধনাই হল ভারতের বিশেষ সাধনা। নানা বিরোধের মধ্যে সমন্বয়-সাধনই ভারতের ব্রত। যে-সব সাধক এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরাই আমাদের দেশের মহাপুরুষ। তাঁদের নামই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বড় বড় যুদ্ধে রণজয়ীদের কথা আমরা ভুলে যাই কিন্তু রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ কবীর রবিদাস নানক চৈতন্য প্রভৃতির কথা আমরা কখনও ভুলতে পারি নে। বিরোধের মধ্যে যোগের সাধনার নামই মধ্যযুগের সাধকদের ভাষায় ভারত-পন্থ, এবং এই সাধনায় সিদ্ধ ভারতপথিকেরাই হলেন ভারতের মহাপুরুষ।

"বীণাতে সরু-মোটা চড়া-খাদ নানা স্বরের বহু তার রয়েছে। তার মধ্যে একটাও তো বাদ দিলে চলে না। কলারসিকের হাতে সব তারের সব স্বর মিলিয়েই পরিপূর্ণ সংগীত বীণায় বাজে। ভারতও যেন একটি বহুতন্ত্রী বীণা। এখানে নানা সাধনার সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ সমবেত সংগীত জাগিয়ে তোলাই হল ভারতের মহাপুরুষদের সাধনা। এমনটি তো আর কোথাও দেখা যায় না। এই হল ভারতের বিশেষত্ব।

"কাজ সহজ করবার জন্য যাঁরা ভারতের এই অপূর্ব বহুতন্ত্রী বীণার নানা বৈচিত্র্যকে জোর করে নিঃশেষ করে এই সর্বৈশ্বর্যময়ী বীণাকে দীনহীন একতারায় পরিণত করে ফেলতে চান তাঁরা ভারতের সেই

মহাধর্ম হতে ভ্রষ্ট। এই বিশেষত্বকে হারালে স্বধর্মভ্রষ্ট ভারতের আর রইল কি? বিধাতা ভারতের গৌরবময় এই মহাসাধনাকে এমন সহজ করেন নি বলেই ভারতের এত দুঃখ এত বেদনা। ভারতের যথার্থ মহাপুরুষেরা এই বিপদ এড়িয়ে শস্তা সহজ পথ যে দেখাতে যান নি সেটাই আমাদের মহাভাগ্য। সুলভ পথের দুর্গতি যেন আমাদের পেয়ে না বসে। তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ভারতের আর কিছু নেই।"

ভারতের পরই এল বাংলাদেশের বিশেষত্বের কথা। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু বললেন, "নদীর পলিমাটিতে তৈরি এই বাংলাদেশ। এখানে ভূমি উর্বর। বীজমাত্রই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে। পলিমাটির দেশ বলেই এখানকার ভূমি কঠিন নয়। তাই পুরাতন মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতির গুরুভার এখানে সয় না। সেই সব গুরুভার এখানে ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশে তাই তীর্থ প্রভৃতি বেশি নেই। পুরাতনের ঐশ্বর্য তার খুবই কম। তাকে দুর্ভাগ্য বলব কি সৌভাগ্য বলব?

"বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্ত। তবে জীবনসাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশি করেই দিয়েছেন। তার দেশ যে পলিমাটির উর্বরভূমি। প্রাণ এখানে ব্যর্থ হতে পারবে না। পুরাতনের মৃত পাষাণভার এখানে না সইলেও জীবনের দাবিদাওয়া এখানে পুরোপুরি সফল হবে।

"এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য মিলনযুগের প্রারম্ভেও তাই বিধাতার প্রথম দাবি এল এই বাংলাদেশে। বড় দুঃখের সেই আবেদন। তাই রামমোহন এদেশে পেলেন নির্যাতন, বিদেশে পেলেন মৃত্যু। এখনও এদেশে তাঁর নির্যাতনের অবসান হয় নি। যত রকমে তাঁকে ভুল বুঝতে ও বোঝাতে পারা যায় আমরা অশেষবিধ বুদ্ধি দিয়ে এখনও নতুন নতুন

করে তার পথ খুঁজছি। আবার তাঁর অনুবর্তী বলে আমরা যারা নিজেদের পরিচয় দিতে চাই তাদের কথা আরও শোচনীয়।

"তবু এই দেশে বিধাতার তরফ থেকে প্রাণের প্রথম প্রার্থনা এসেছে এই বাংলাদেশে। এজন্য এই দেশকে আজ পর্যন্ত কম দুঃখ সইতে হয় নি। অবশ্য এই দেশেই এ-পথের পথিকদের দুঃখ দেবার জন্যও বহু লোক জন্মেছে। তাদের মধ্যে কেউ বা গুপ্তচর হয়ে পায় সরকারি বেতন, কেউ বা প্রকাশ্যচর হয়ে পায় সংকীর্ণদৃষ্টি মোড়লদের তলব ও উৎসাহ। বাংলাদেশের দুঃখের অন্ত নেই। তবু যাঁরা সত্যকার বাংলাদেশের সাধকসন্তান তাঁরা কখনও এই দুঃখকে কোনো মতেই এড়াতে চান নি। এই সাধনায় চিরদিনই বাংলা সাড়া দিয়েছে। তার জন্য প্রাণ বিসর্জন করতেও সে ভয় পায় নি।

"প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে। জীবন্ত ক্ষেত্রে জীবনের দাবিই চলে। কিন্তু তাই বলে এদেশের সাধনাকে পুরাকালের পাথরের জগদ্দল্ চাপে কঠিন ও ভারগ্রস্ত করে রাখলে তো চলবে না। মন্দিরের প্রাসাদের পাষাণভারে বাংলাদেশের উর্বর বিস্তারটিকে ঢেকে ফেলে জীবনের সেই দায়িত্বকে এড়াতে চাইলে আমরা হব ধর্মভ্রষ্ট।

"নানা ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সাধনার ইতিহাস দেখলে আমার এ-সব কথার সত্যতা বোঝা যাবে। মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজ-নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত-সংস্কারমুক্ত। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি মত এই দেশে বা তার আশেপাশে চিরদিন প্রবল ছিল। তখন মগধও বাংলার সঙ্গেই ছিল একঘরে অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে। বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যেও

দেখা যায় সেই স্বাধীনতা। তাদের সাহিত্যে ও গানে অলঙ্কার বা শাস্ত্রের গুরুভার তারা কখনও সইতে পারে নি। শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই অথচ কি গভীর কি উদার তার ব্যঞ্জনা। এদেশের কীর্তন-বাউল-ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানে খুব সাদা কথায় এমন অপূর্ব মানবীয় ভাব ও রস সাধকেরা ফুটিয়ে তুলে গেছেন যে কোথাও তার তল মেলে না, কূল মেলে না। অপার মানবীয় ভাবের কোথায় সীমা কোথায় শেষ? প্রাণের মতোই তা সর্বভারমুক্ত ও সহজ তার অতল অপারতার রহস্য।

"গঙ্গা ও সাগরের সংগম ঘটেছে এই দেশে। উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে এই বাংলার সাধনাক্ষেত্রে। এ দেশ তাই নানাদিক দিয়েই মিলনের ক্ষেত্র। দিন ও রাত্রি মেলে সকাল ও সন্ধ্যায়। সেইরূপ সন্ধ্যার মিলনক্ষেত্রে যেমন ধ্যানযোগের সময়, বাংলাদেশের মিলনতীর্থে তেমনি রয়েছে বহু তপস্যার জন্য প্রতীক্ষা। কোনো লঘুতা চপলতা চঞ্চলতা এখানে চলবে না। এখানকার উপযুক্ত সাধনা হল ব্যাহৃতি-মন্ত্র 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'। অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষ-বিশ্বচরাচরে বিস্তৃত হোক আমাদের ধ্যান। কাজেই এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান নেই।

"বাংলাদেশের এই উদার বিস্তৃতির ফল দেখা যাবে তার সর্বক্ষেত্রে। তার শিল্পে সংগীতে সাহিত্যে সাধনায়। সুরে ও বাণীতে অপূর্ব শিবশক্তির মিলন চিরদিনই বাংলা গানে যেমনটি দেখা যায়, তেমনটি ভারতে আর কোথাও ঘটেছে বলে শুনি নি। কীর্তনে বা বাউল গানে ভাবের মন্দিরে এখানে যে অপূর্ব পূজাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে তাতে নানা ফুল মিলিয়ে অপরূপ অর্ঘ্যরচনা করা হয়েছে। ভাবের রূপটি ফুটিয়ে তোলবার জন্য বাংলাদেশের সাধকেরা প্রয়োজনমত নানা সুর ও তালকে অপরূপভাবে সংগত করেছেন। তাতে প্রেমভক্তির যে প্রসাদ বাংলার রসমন্দির হতে

পরিবেশন করা হয়েছে তার আর তুলনা নেই। কত ফুলের মধু আহরণ করে এখানকার উপাসকেরা এই অসাধ্য সাধন করেছেন।"

আমি বললাম, "শুধু ভাবের রসশালায় নয়, সংসারের রসবতী বা পাকশালাতেও বাংলাদেশ যে নানা শাকসবজি মিলিয়ে অপূর্ব-সব ব্যঞ্জন রচনা করেন ভারতের অন্যপ্রদেশে তার চলন নেই। সেখানে বেগুনের শাক তো বেগুনেরই শাক, কুমড়ার তরকারি তো কুমড়ারই তরকারি, আলুর ভাজি তো আলুরই ভাজি, মিলিয়ে মিশিয়ে রাঁধবার জো নেই। তাঁদের কলামন্দিরেও যেমন রসবতীতেও তেমনি। যোগ বা সম্মিলনের উপায় নেই। এখন অবশ্য বাংলার মত অন্যত্রও শাকসবজি মিলিয়ে রান্না কিছু কিছু শুরু হয়েছে। তা ছাড়া রসবতীতে বাংলার বিশেষ দান হল সন্দেশ ও রসগোল্লা। এখন বাংলাদেশের বাইরেও তার অসম্ভব সমাদর।"

কবিগুরু হেসে বল্লেন, "সন্দেশে বাংলাদেশ বাজিমাৎ করেছে। যা ছিল শুধু খবর বাংলাদেশে তাকেই সাকার বানিয়ে করে দিল খাবার। এখানকার সন্দেশেও খবর-খাবারের অর্থাৎ সাকার-নিরাকারের শিবশক্তি-মিলন।" এই কথা শুনে শীলমহাশয় খুব হেসে উঠলেন।

সেদিন আমার মনে হলে বলতাম, বাংলার আর-একটি অপূর্ব অর্ঘ্যাঞ্জলি হল তার anthology অর্থাৎ নানাবিধ কবিবাণী-সংগ্রহ। সেদিন কথাটা মনে হয় নি। তবু এই প্রসঙ্গে তা বলা উচিত।

এক-এক কবি এক-এক রকমের কাব্য *সৃষ্টি* করেন। এক-এক ভাবের ক্ষেত্রে নানা কবির নানা কাব্যকুসুম নিয়ে বিচিত্র অঞ্জলি সাজানোর কাজেও বাংলাদেশই প্রথম সাধনা করেছে। বাংলাদেশের চর্যাপদগুলিতে নানা কবির বাণীসংগ্রহ দেখা যায়। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় গ্রন্থখানি বোধ হয় ১০০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি লেখা। প্রায় নয়শত বৎসরের পুরাতন

বাংলা লিপিতে গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়েছে। তাতে নানা ভাবের নানা ব্রজ্যা। এক-একটি ব্রজ্যাতে নানা কবির নানা বাণী সংগৃহীত। তারপর ১২০৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে সংগৃহীত হয় শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত।

কাশ্মীরের জল্হণ কবির সুভাষিতমুক্তাবলী সংকলিত হয় এর ৪২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৪৭ খ্রীস্টাব্দে। শার্ঙ্গধর-পদ্ধতির সংগ্রহ হয় ১৩৬৩ সালে। বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী পঞ্চদশ শতকের। সুভাষিতাবলী আরও পরের। এর পরে ভারতে নানা স্থানে আরও নানা কাব্যপুষ্পাঞ্জলি সংগৃহীত হয়। কিন্তু নানা কবির রচনাসংগ্রহ-ব্যাপারে বাংলাদেশই প্রথম পথপ্রদর্শক। চৈতন্যযুগেও শ্রীরূপ গোস্বামী ১৫৪১ সালের পূর্বেই পদ্যাবলীতে নানা ভক্তকবির বাণীসংগ্রহ করেন। ইহার ৬৩ বৎসর পরে পাঞ্জাবে গুরুদের বাণী গ্রন্থসাহেব সংগৃহীত হয়। পারস্য ভাষাতেও এইরূপ বহু পুষ্পাঞ্জলি সংগৃহীত হয়েছে। তাহাকে "গুলদস্তা" বা কুসুম-সঞ্চয়ন বলে।

বাংলাদেশের কথকদের নানা ঘরানাতে এখনও নানাবিধ কবিবচন-সংগ্রহ আছে। সেগুলি প্রকাশিত হলে এই বিষয়ে বাংলাদেশের অতুলনীয় প্রতিভার আরও পরিচয় পাওয়া যেত। সেদিন কিন্তু এই সব কথা মনে আসে নি, তাই বাংলাদেশের এই ভাবের চয়ন-প্রতিভার কথা সেদিন বলাও হয় নি।

কবিগুরু বলতে লাগলেন, "সঞ্চয়ন-প্রতিভা বাংলাদেশের একটি বিশেষত্ব। বাংলার শিল্পেও তা দেখা যায়। প্রাণী যেমন নানা খাদ্য হতে নানা প্রাণরস নিয়ে জীবনে সমীকৃত করে (assimilate) তেমনি নানা উপকরণ দিয়ে বাংলাদেশ তার শিল্প ও কলাকে জীবন্ত করে তুলেছে। প্রাণ জিনিসটা বড়ই রহস্যময়। সে যা নেবার তা ভালো করেই নেয় অথচ বৃথা-ভার সে জমিয়ে রাখে না। যা-কিছু প্রাণের পক্ষে

অনাবশ্যক তা সে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করে (elimination)। শরীর যখন এই শক্তি হারায় অর্থাৎ যা ত্যাজ্য তা ঠিকমত ত্যাগ করতে না পারে তখনই নানা ব্যাধি ও দুর্গতি এসে তাকে ঘিরতে থাকে। বাংলাদেশ চিরদিনই এই ব্যাধি হতে মুক্ত ছিল।

"বাংলাদেশে চিত্রে ও পাষাণমূর্তিতে যে প্রাণের লীলা দেখা যায় তা সর্বভাবে পুরাতন শাস্ত্র ও বৃথা-ভার হতে মুক্ত। অথচ তাতে নতুন পুরাতন এদিক ওদিকের সবরকম সরস জীবন্ত উপকরণগুলি প্রাণশক্তির রহস্যময় কৌশলে সংগত হয়েছে। তার মধ্যে কোনোটা বাদ দিলেই প্রাণধর্ম ও বাংলাদেশের সাধনার স্বধর্ম ক্ষুন্ন হবে।

"বিশ্ববিধাতা যেন মনে মনে এই কথাই চিরদিন চেয়ে এসেছেন যে, এই বাংলার তীর্থক্ষেত্রে সকল সাধনারই মিলন ঘটবে। শুধু বিধিবিধানের বাহ্য দাবিতে সেই মিলনটি তো ঘটবার নয়। এই প্রেম-মিলনটি ঘটবে প্রাণের দাবিতে। তাই বাংলার সকল সাধনাতেই রয়েছে প্রাণের একটি সহজ আবেদন। বাংলার সংগীত শিল্পকলা সর্বত্রই এই সত্যকে আমরা দেখতে পাই। উপকরণবাহুল্য বাংলাদেশের সাধনায় সইবে না।"

তখন আমি বললাম, "বাংলার পাষাণশিল্পে কতকগুলি মূর্তি আছে যাকে বলে কীর্তিমুখ। সেগুলিতে বহু অলংকারের বিপুলভার। কিন্তু এখানকার ছত্রমুখ মূর্তিগুলি খুবই সাদাসিধা। তাতে কিছুমাত্র মণ্ডন-বাহুল্য নেই অথচ তার ব্যঞ্জনার শেষ নেই। উত্তরবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের সংগৃহীত অনেক মূর্তিশালায় এই ছত্রমুখ শিল্পের নমুনা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।"

কবিগুরু বললেন, "সেই ছত্রমুখমূর্তিগুলিই হল বাংলাদেশের আসল শিল্পসাধনা। এইগুলিই তার নিজস্ব তপস্যা। কীর্তিমুখ মূর্তিগুলিতে বাংলাদেশ করেছে বাইরের চেলাগিরি। বাংলাদেশের সংস্কৃত-রচনায় যে

গৌড়ীয় রীতি দেখতে পাই তাতে শব্দ ও অলংকারের গুরুভার। সেখানে বাংলাদেশ অন্য দেশকে চোখের সামনে রেখেই সকলকে বিস্মিত করে দিতে চেয়েছে। সেখানে সে আপনার অতল অপার তপস্যার সন্ধান পায় নি। তা পেয়েছে সে তার প্রাকৃত সাহিত্যে ও গানে। কীর্তনে ও বাউল-গানে তার পরিচয়। প্রাণের স্বাভাবিক সাধনার প্রাকৃত এই ভূমিতে বাহ্য শাস্ত্র ও বিধি-বিধানের জগদ্দলের ভার সইবে কেন?

"বাংলাদেশের আর-একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এর সুকুমার সূক্ষ্মতাবোধ। কার্পাস তো আরও কত জায়গায়ই আছে কিন্তু ঢাকার মসলিনের মত সূক্ষ্মতা কোথায়। এখানে মেয়েদের হাতে যেমন সূক্ষ্ম সুতো ওঠে তেমনটি আর তো কোথাও হয় না। সে সুতো এত সূক্ষ্ম যে একটু কঠিন স্পর্শ তাতে সয় না। এমন সুকুমার কলার উপযুক্ত দরদী পরশ এখানেই মিলবে। যে-দরদী হাতে মসলিন-সুতোর সৃষ্টি সেই হাতে বাংলার বহু সুকুমার শিল্প গড়ে উঠেছে। এর উপর কি কোনো নিষ্ঠুর মৃত আবর্জনার ভার সয়?

"গুড়ের সঙ্গে নাকি গৌড়ের যোগ আছে। এই যোগ হল শব্দ-শাস্ত্রের। কিন্তু মাধুর্যের সঙ্গে এ-দেশের চির যোগ। নীরস শুষ্ক পথ এ-দেশের নয়। জলপথের পথিক আমরা শুষ্ক ধুলোর পথে চলতে পারি নে। আমাদের পথও সরস জীবন্ত জলধারা। সর্বত্র সে প্রাণ-সঞ্চার করে। শুকিয়ে মারবার নিষ্ঠুর রীতি সে জানে না।

"বাঙালী সুজলা সুফলা জননীর সন্তান, কাজেই জমিয়ে রাখবার প্রবৃত্তি তার কম হতে পারে। তাই সে ভালো 'বেনে' না হতেও পারে কিন্তু তার দেশ বিস্তৃত বলে তার দৃষ্টিটে উদার হবাই কথা। এই দেশ সমতল। কাজেই এখানে উচ্চ-নীচ ভেদবুদ্ধির ওসব কৃত্রিম বাধা থাকবে কেন?

"পূর্বেই বলেছি পুরাতনের ভার এখানে নেই। তাই এ-দেশে

তীর্থের ভার নেই। বাংলাদেশ যে দেবভূমি নয়, এ দেশ মানবের দেশ। বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে। বাংলার শিবে-দুর্গায় বাঙালী-চরিত্রেরই প্রকাশ। গঙ্গা-গৌরীর কোন্দলে শিব-দুর্গার কলহে আমাদেরই ঘরোয়া ঝগড়া। ভালোমন্দ সব নিয়েই আমাদের শিব আমাদেরই আপন মানুষ। বাঙালীর রাম তো বাল্মীকির রাম নন। আমাদের কৃষ্ণকেও শাস্ত্রে খুঁজে পাই নে অথচ আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁকে খুবই দেখতে পাই। দেবতাকে প্রেমের জন বলে দেখেচেন বলে বাংলাদেশের সাধকেরা তাঁদের রচনায় যে দরদ দেখিয়েছেন সে-দরদ আমরা শাস্ত্রপন্থীদের কাছে আশাই করতে পারি নে। আমার "বৈষ্ণব-কবিতা"য় এই কথার একটু আভাস আমি একদিন দিয়েছিলাম। দেবতায় মানুষে এখানে কোনো অনৈক্য নেই। মানবতাধর্মই যে আমাদের ধর্ম একথা আমি দেশে-বিদেশে উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছি।

"বাংলাদেশের তলায় সমুদ্র। তার তীরবাসীরা সাহসী। পূর্ববঙ্গে নিত্যই নদীর ভাঙাগড়া। সেখানে চরের লোকেরা নির্ভীক উৎসাহী। গঙ্গা এখানে সারা ভারতের আশীর্বাদ বহন করে আসছে। এখানকার মাটিতেও নানা জাতি ও সংস্কৃতির মিলনতীর্থ। তাই এর একটি বিশেষ মহত্ত্ব রয়েছে।"

ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় মানবতত্ত্বের খুব বড় পণ্ডিত। তিনি বললেন "বাংলাদেশে কত-জাতীয় মানুষের যে মিলন ঘটেছে তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আর্য অনার্য ভোট কিরাত প্রভৃতি মঙ্গোলিয়ন জাতি মিলেছে। মণিপুর দিয়ে শাণবাসী চীনেরা এসেচে। গারো-খাসিয়া-কাছাড়ী কোচ প্রভৃতি জাতি এখানে আছে। সাঁওতাল ভীল কোল প্রভৃতিরা রয়েছে। দ্রাবিড়দের তো এটা একটা মূল আস্তানা। বহু মানবজাতির

মিলনভূমি বলেই মানবতত্ত্বসম্বন্ধে বাঙালীরা এত সচেতন।" এই বিষয়ে তিনি চমৎকার একটি আলোচনা করলেন।

আমিও বললাম, "আমাদের দেশের ধর্মে ও আচারে এমন বহু জিনিস আছে যা দ্রাবিড়াচারের সঙ্গেই মেলে। বাংলাদেশের ঘরবাড়ির সংস্থান উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সংস্থানের সঙ্গে মেলে না। বরং তা মেলে কেরল কোচিন প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে। বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যেই তাদের দিঘি পুষ্করিণী, নিজেদের জমিতেই তাদের চিতা রচনা করতে হয়। আমাদের জাতাচার মৃতাচার বিবাহ-আচার, মঙ্গল-অমঙ্গল, সুযাত্রা-অযাত্রা প্রভৃতি অনেক সংস্কারই মেলে দক্ষিণের সঙ্গে। তাদের মতই আমরা উঠোনের মধ্যে অস্থায়ী আঁতুড় ঘর বাঁধি। আদ্য ঋতুতে মেয়েদের আচার ও ঋতুকালে মেয়েরা যে-নিয়ম পালন করে তাও সেই দেশের মত। ধোপার হাতে বস্ত্র না দিলে তখন তা শুদ্ধ হয় না। বিধবাদের আচারও অনেকটা একই রকম। কনের বাড়িতে বর বিবাহ-মাদুলি পাঠায়। কলাতলায় বরকন্যা পুকুরখেলা করে। এই সবই দক্ষিণী আচার।

"উত্তর-ভারতের ফলিত জ্যোতিষে সর্বত্রই বিংশোত্তরী গণনা, বাংলা-দেশে অষ্টোত্তরী। জাতকর্ম অন্নাশন হতে এখানে সব অনুষ্ঠানেই মাতুলের একটি প্রধান স্থান, মাতুলালয়েরও অনেক কৃত্য সেই সব অনুষ্ঠানে রয়েছে। এই সব দেখে বাংলাদেশের আচারকে দক্ষিণভারতের আচারের সঙ্গেই যুক্ত মনে করা স্বাভাবিক। সেখানকার নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের কেরলাচার বাংলাদেশের আচারের সঙ্গে এত মেলে যে অনেকে বলেন নম্বুদ্রীরা কোনোকালে হয়তো বাংলাদেশ থেকেই গেছেন। তাঁদের মত আচারনিষ্ঠ বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ নেই অথচ বিবাহকালে তাঁদের আচার আছে যে পুকুর হতে মাছ ধরার অভিনয় করতে হয়। বিবাহে কাঁসার দর্পণ ও অস্ত্র

হাতে করে বর যাত্রা করেন। বাংলা ছাড়া আর তো কোথাও উলুধ্বনি শুনি নি কিন্তু দক্ষিণে নায়ার প্রভৃতি জাতির মধ্যে তা আছে। তার নাম 'কুড়ুবা'। বাংলাদেশের কীর্তনাদিতে যে সব তাল তার মিল রয়েছে দক্ষিণী তালের সঙ্গে। আচার্য ভাতখণ্ডে একবার এই সব দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।" বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাকরণগুলিরও উৎপত্তি দক্ষিণভারতে। পাণিনির ততটা চলন এদেশে নেই। তবে পাণিনির পণ্ডিত এদেশে যে না জন্মেছেন তা নয়। আয়ুর্বেদ ও রসশাস্ত্রে বাংলা-দেশের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় কেরলাদি ভূভাগ। আয়ুর্বেদের ধাতু-চিকিৎসা-প্রকরণে বাংলার একটি বিশিষ্ট স্থান।

এই রকম নানা আলোচনা চলছিল নানাভাবে এই সব বিষয়ে। কবি-গুরু নতুন নতুন আলোকপাতও করছিলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, " 'ভারতের ইতিহাসের ধারা'য় তবু কিছু লিখেছি সে বিষয়ে। আরও অনেক কথা লিখবার আমার ইচ্ছা ছিল। বিশেষত মহাভারতের মর্মসত্যটি ভাল করে দেখিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার ছিল। মহাভারতের চরম কথা বড়ই মর্মান্তিক। অনেকবার তা বলতে গিয়েছি। বলা আর হয় নি। এখন আর শক্তিতে কুলোবে না। বাংলার কথাও কিছু লেখা দরকার। কিন্তু এখন অবসর একেবারেই নেই। আর বার্ধক্যের প্রভাবও তো রয়েছে। সে কথা ভুললে চলবে কেন? এ-কাজে আপনারা কেউ হাত দিলে ভাল হত।"

এই কথা বলে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর সেই দৃষ্টিতে মনে মনে বড়ই ভয় হল। তবে তিনি কি আমারই কাছে কিছু চান? সংকোচের সহিত আমি বললাম, "সে-দৃষ্টি কি আমাদের আছে? আর বাংলাদেশের নানা দিক। তার কতটুকুই বা জানি। এ দেশের ধর্ম ও সাধনার কথা নিয়েই কিছু নাড়ানাড়ি করেছি। তাতে কি আর সব দিকের কথা বলা চলে? তাই সাহস যে পাই নে।"

তিনি বললেন, "সেই দিক দিয়েই না-হয় আপনার যা বলবার আছে তা বলে দিন। তারপরে সেই প্রসঙ্গে আর কিছু যদি মনে আসে তবে তাও প্রকাশ করে বলতে পারবেন। ভয় পাবেন না। কাজ করে যান, আমরা সবাই তো চারদিকে আছি। সবাই আপনাকে শক্তি দেব।"

কাজটা বিরাট। তাঁর কথাটাও উপেক্ষণীয় নয়। অগত্যা চুপ করে বসে রইলাম। মনে মনে ভয়। অথচ বুঝতে পারছি কথাটা উড়িয়ে দিলে চলবে না। বিষম বিপদ।

তারপরে দিনের পরে দিন যায় অথচ মনের ভার আর যায় না। তিনি ইহলোক হতে বিদায় নিলেন। এতদিন যা ছিল অনুরোধ তা হয়ে উঠল আদেশ। কাজেই এই আদেশ পালন না করলে অপরাধ হবে।

বাংলাদেশের নানা সাধনার সন্ধান ও সংগ্রহ করতে লাগলাম। কিছু কাজও হল। বই লেখাও হল। বইখানা ছোট হল না। কিন্তু বাজারে নেই কাগজ, ছাপাও দুঃসাধ্য। ইতিমধ্যে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন হবার কথা হল। সেখানকার পরিচালকেরা আমাকে দর্শনশাখার কাজে ডাকলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের সভা। রাজসূয় কাণ্ড। কিছু বলতেও সংকোচ হয়। সেখানে সবার আগ্রহে কিছু বলতেই হল। অথচ আস্ত পুঁথি সবার মাথার উপর নিক্ষেপ করতে মন চাইল না। যা বলবার তার দু-চারকথা মুখেই বললাম।

বসেছিলাম দর্শনের আসনে। কিন্তু ধর্মবিষয়ে আলোচনাই আমার কাজ। তাই ধর্মের বিষয়ে নানা তথ্যই আমার কথায় বেশি এল। তাতে কেউ যে আমার উপর রুষ্ট হলেন তাও তো বোঝা গেল না। বরং অনেকে আমার বক্তৃতাটুকু লিখিত আকারে দাবি করলেন।

আমার বইখানি একদিন মুদ্রিত হলেই আমার কর্তব্যপালন করা হবে

এইকথা মনে করেই অনেকদিন আর কিছু করি নি। ইতিমধ্যে বন্ধুজনের তাগিদ আসতে লাগল। দিল্লীতে যা মুখে বলেছি অন্তত তাই যেন এখন লেখা হয়। বড় বই যখন বের হবে তখন হবে।

তাঁদের অনুরোধেই আজ বাধ্য হয়ে লিখছি। বাংলাদেশে সাধনার প্রাণবস্তু যা বুঝেছি যথাসাধ্য অল্পের মধ্যে তা প্রকাশ করবার চেষ্টা করা গেল।

যাঁর আদেশে ও নির্দেশে একদিন এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম আজ তিনি সশরীরে এই জগতে নেই। তবু তাঁর কথাই বারবার মনে আসছে, তাঁর কথাগুলি যেন এখন শুনতে পাচ্ছি—"আমরা আছি।"

যেদিন তিনি এই আদেশটি দেন সেই দিন বলেছিলেন, "ভয় পাবেন না। কাজ করে যান। আমরা আছি। সবাই আপনাকে শক্তি দেব।" তাঁর সে বাণী কি আজ মিথ্যা হবে? আজও তিনি নিশ্চয় আমাদের মধ্যে প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করছেন। এখনও তিনি আমাদের ঘিরে রয়েছেন। তবে ভয় কিসের?

তাঁরই কথা আজ বারবার মনে আসছে। তাঁর মৃন্ময় কায়া আজ নেই তবে চিন্ময় বিগ্রহে আজও তিনি বিরাজমান। মহাপুরুষদের তো মৃত্যু নেই। আজ যদি এই সামান্য পূজাঞ্জলি দেখে তিনি তৃপ্ত হন তবেই সকল শ্রম সার্থক মনে করব। এই কথা মনে করে তাঁরই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি আজ শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করি।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

জ্ঞান ও ধর্ম

ভক্ত যখন গাইলেন

দোষ কারে দিব গো মা,

আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

তখন তিনি ভেবেছিলেন বুঝি তিনি তাঁর নিজ জীবনের দুঃখ-দুর্গতির কথাই বলছেন, কিন্তু তাঁর এই গানে জগতের সব দুর্গতিরই মূল কথাটি বলা হয়ে গেল। মানুষের দুর্গতির তিন পোয়াই তার স্বখাত সলিলে ডুবে মরা। এই দুর্গতি দূর করতেই তার যত যুদ্ধবিগ্রহ। তাতে কি দুর্গতি কমে? রক্ত দিয়ে রক্তের দাগ ধুয়ে ওঠানো কি যায়?

এই দুর্গতি দূর করবার জন্যই মানুষের নানা চিন্ময় সাধনা। ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানাভাবে সেই দুর্গতি মেটাবারই চেষ্টা। আবার এইগুলির মধ্য দিয়েও মানুষের কম দুঃখ-দুর্গতি আসে নি। সেইসব দুর্গতি দূর করতেও চাই প্রেম-মৈত্রী। জগতে সকলের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য মানুষের অচেতন মনকে জাগিয়ে তুলতে ও সাধনাকে স্থাপন করতে, দুঃখ-দুর্গতির প্রতিকার করতে, চাই জ্ঞান ও প্রেম। সব দুঃখের মূলেই অজ্ঞান ও অপ্রেম। সত্য-জ্ঞান ও দৃষ্টি ছাড়া তার প্রতিকার কই? তাই এই দুর্দিনেও জ্ঞানালোচনায় আসতেই হবে। চিন্ময় দীপ কিছুতেই নিবতে দেওয়া তো চলে না, কারণ তাতেই সব সত্যকে দেখতে হবে। তাই তার নাম দর্শন। সেই দর্শনই সকল জ্ঞানের মূল। এই মূল হতেই জ্ঞানের নানা আলোক নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই হিসাবে দর্শনই সকল জ্ঞানের আত্মা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, "এই সত্যই হল সর্বভূতের মধু, সত্যই অমৃত, সত্যই ব্রহ্ম, সত্য সর্বস্ব।"

ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধু…
ইদং অমৃতং, ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্বম্ ।১

সত্যই মানবজীবনের দর্শনীয়, সেই মূল সত্যকে জানতে হবে। চাকার কেন্দ্রে যেমন সব দণ্ড ('অরা') গুলি বিধৃত তেমনি এই মূল সত্যেই সব সত্য বিধৃত।

তদ্‌যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ
অরাঃ সর্বে সমর্পিতাঃ। ২

সেই মূল সত্যের জ্ঞানই তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শন। ঐ সময়েই যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ধর্মও সর্বভূতের মধু।

ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু।৩

কাজেই ধর্মে ও সত্যদর্শনে ভেদ কোথায়? এদেশে ধর্ম ও দর্শন শিবশক্তির মতই পরস্পরে যুক্ত। একক ছেড়ে অন্যটি থাকতেই পারেন না। কাজেই দর্শনের কথা আলোচনার সঙ্গে ধর্মকেও আনতেই হবে।

ভক্তেরাও বলেন, "এ দুয়ের মধ্যে ভেদ কোথায়? বাইরে থাকলে যা সত্য, জীবনে গৃহীত হলে তারই নাম ধর্ম। বাইরের অন্ন দেহে গৃহীত হয়ে যেমন হয় প্রাণশক্তি, তেমনি বাইরের সত্যজ্ঞান ও মতবাদ জীবনে গৃহীত হয়ে হয় সকল ধর্মের চিচ্ছক্তি।" রসায়নশাস্ত্র যখন প্রাণবন্ত হয়ে জীবন্ত রসায়ন অর্থাৎ Organic Chemistry হয় তখনই তা জীবনকে পালন-পোষণ করতে পারে। দর্শনও যখন ধর্ম ও জীবনরূপে Organic হয়ে প্রাণবন্ত হয় তখনই তা আমাদের সত্যকার কাজে লাগে, তখনই জীবনের সঙ্গে যথার্থ যোগ হয়।

আমাদের দেশে যখন থেকে আমরা দর্শনকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ না করে শুধু মতবাদরূপেই বাইরে রেখেছি তখন থেকেই আমরা উপবাসী

(১) বৃহদারণ্যক ২, ৫, ১২ ॥ (২) বৃহদারণ্যক ২, ৫, ১৫ ॥ (৩) বৃহদারণ্যক ২, ৫, ১১।

নির্জীব। মতামত ও জীবন যাদের এক তারাই শক্তির অধিকারী। আমাদের পুরাতন সব দর্শনের আরম্ভেই দেখবেন তাঁদের সবারই জিজ্ঞাসা হল মুক্তির জন্য। অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছাটা জীবনের ও সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। তা শুধু কথার কথা বা শূন্য মতবাদের বাগ্‌বিলাসমাত্র নয়। তাই পূর্বে আমাদের দেশে ধর্মে জ্ঞানে কোনো ভেদ-রেখাই টানা চলত না। আমার পক্ষে তো তা আরো অসম্ভব, কারণ ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস নিয়েই আমার আলোচনার ক্ষেত্র, তাই সেটা ঠেকাই কি করে?

মানুষের যেমন জাতিভেদ জ্ঞানেরও তেমনি জাতিভেদ মানা যেতে পারে। এক-এক বিষয়ের ও এক-এক রকমের জ্ঞানের এক-এক বিশেষ জাত মনে করা যায়। পাশ্চাত্ত্য জগতে মানুষের জাতিভেদ হয়তো এ দেশের মত না থাকতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে তাদের ভীষণ জাতিভেদ। এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্রের সীমানার মধ্যে পা বাড়াতে সাহস করে না, কারণ প্রত্যেকেরই সীমা সরহদ্দ সুনির্দিষ্ট এবং অস্ত্রে-শস্ত্রে রীতিমত সুরক্ষিত। আমাদের দেশে মানুষের জাতিভেদ থাকলেও জ্ঞানের রাজ্যে জাতিভেদ নেই। এখানে ধর্মে-দর্শনে হরিহরাত্মা। দর্শনে-কাব্যে গলাগলি। ন্যায়ের ক্ষেত্রে এদেশে দেখা যায় মুক্তাবলী ও কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি কবিত্ব-সম্পদ। পরিমল, কল্পতরু, কল্পলতিকা, মনোরমা প্রভৃতি নাম দিয়ে গভীর সব দার্শনিক জ্ঞানের কথাই এদেশে বলা হয়েছে। এদেশে গণিতশাস্ত্রকেও কবিত্ব করে কবিতায় দেখান হয়েছে। গণিতগ্রন্থের 'লীলাবতী' নাম কি আর কোনো দেশে সম্ভব?

তাই এদেশে দার্শনিকেরাও মহাভক্ত ও কবি হয়ে গেছেন। মহাপ্রভু তো পূর্বে নৈয়ায়িকই ছিলেন। মধুসূদন সরস্বতী ছিলেন ভারতীয় সর্বদর্শন ও সর্ববিদ্যার পরিপূর্ণ বিগ্রহ। নির্বিশেষ 'তৎ'-শব্দ-প্রতিপাদ্য

ব্রহ্মকে নিয়ে মধুসূদন জ্ঞানের যে অপরিমেয় ঐশ্বর্যের পরিচয় দিলেন তাতে সারা ভারত বিস্মিত হল, তবু অবশেষে বাংলাদেশের মানবীয় ভাবেরই জয় তাঁর জীবনেও ফুটে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত দার্শনিকতা ভাসিয়ে দিয়ে এলেন ভক্তির পথে। তাঁর রচিত গ্রন্থের যেমন অতুল গভীরতা তেমনি শতাধিক সংখ্যা। তাঁর অদ্বৈতসিদ্ধি, সিদ্ধান্তবিন্দু, প্রস্থানভেদ প্রভৃতি বহু-বহু গ্রন্থ সর্বভারতে চিরদিন জ্ঞানীদের বন্দনীয় হয়ে থাকবে। তিনিই তাঁর ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের পরিশেষে বলছেন, "একদিন ছিলাম আমরা অদ্বৈতপথের পথিকদের আরাধ্য; স্বানন্দ সিংহাসনে বসে বসে দীক্ষা পূজা পেয়েছি। আজ একি হল! গোপবধূপ্রণয়রসিক প্রেম-লীলাময় চতুরের প্রেমের এ কি জুলুম! শেষকালে কিনা তাঁরই চরণে এসে বাঁধা পড়তে হল!"

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥১

দার্শনিক সব গভীর তত্ত্ব এদেশে প্রচারিত হয়েছে কবিতায় ও গানে। দর্শনে-সংগীতে যে বিবাদ তা এদেশে নেই। বাংলাদেশের বাউলেরা সুরে তালে যে-সব গভীর তত্ত্ব গান করেছেন তা আর কোনো ভাষায় বা আর কোনো প্রকারে প্রকাশ করাই অসম্ভব। কাজেই এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান-কাব্য-সংগীত পরস্পরে পরস্পরকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলেছে। ধর্মে ও জ্ঞানে এদেশে বিরোধ ঘটে নি। এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটলে দুঃখের আর অন্ত থাকে না।

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১০ম পরিচ্ছেদে এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টম অঙ্কে ধৃত।

মধ্য যুগের একটি গল্প বলি। এক রাজার রাজ্যে হরিণের দল চ'রে বেড়াত। রাজা ভালোমানুষ। তবে বাইরে থেকে কেউ-কেউ মাঝে-মাঝে এসে সেখানে মৃগয়া করত। হরিণের দল রাজাকে বলল, "মহারাজ, আমাদের বিপদ দূর করতে হবে।" রাজা বললেন, "আমি তো কই তোমাদের মারি নে, তবে অপর কেউ কখনও তোমাদের মারবে না এমন আশ্বাস দিই কি করে?" হরিণের দল সন্তুষ্ট না হয়ে নানা দেশে নিরাপদ স্থান খুঁজতে বের হল।

এক রাজ্যে গিয়ে দেখে অরণ্যসীমায় পাষাণে লেখা আছে, "এখানে কাউকে মৃগয়া করতে দেওয়া হয় না।" হরিণের দল সেই দেশের রাজার কাছে গেল। তিনিও বললেন, "তাই বটে, সত্যিই আমি এখানে কাউকে মৃগয়া করতে দিই নে।" হরিণের দল আশ্বস্ত হয়ে পূর্বরাজ্যের রাজাকে গিয়ে সব কথা বলে তাঁর রাজ্য ত্যাগ করে এখানে চলে এল।

দিন যায়, বিপদ-আপদ নেই। হরিণেরা আরামে বাড়ছে। একদিন দেখে নূতন রাজা হাজার লোকলস্কর নিয়ে সমস্ত বন ঘিরে নিজেই সব পশুশিকারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। একটি পশুরও পালাবার পথ নেই। মৃগপতি রাজাকে জিজ্ঞাসা করলে, "একি মহারাজ, আপনি নাকি এখানে কাউকে শিকার করতে দেন না।" রাজা বললেন, "অপর কাউকে দিই না বটে কিন্তু খেয়াল হলে নিজে শিকার করি।" মৃগপতি বললে, "আর কেউ শিকার করলে তবু দু-একটা মাত্র মারত, কিন্তু এমন করে সর্বঘাত তো হত না। আপনি যে আমাদের নিঃশেষ করতে চলেছেন! এখন কে আমাদের বাঁচায়। কস্ত্রাতা নো ভবিষ্যতি।"

হরিণের মত আমরাও একদিন যে-রাজার রাজ্যে ছিলাম তাঁর নাম 'ধর্ম'। তিনি কখনো আমাদের নাশ করেন নি। তবে অন্যদের সবরকম মার হতে সব সময় আমাদের রক্ষা করতেও ধর্ম পারেন নি।

এমন সময় নতুন রাজা এলেন 'বিজ্ঞান'। তিনি বললেন, "এ সব বিপদ হতে তোমাদের আমি রক্ষা করব।" করলেনও তাই। অন্ন বাড়ল, পণ্য বাড়ল, আধিব্যাধি দূর হল। সকলে ভাবলাম, বেশ আছি —পুরাতন রাজা তো এইসব করতে পারতেন না। তাই ধর্মকে ছেড়ে আমরা বিজ্ঞানের রাজ্যেই গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

কিন্তু হায়, আজ হঠাৎ একি দেখি! বিজ্ঞান-প্রভু স্বয়ংই আকাশে উঠে চারিদিকে মৃত্যুকে বর্ষণ ও বিকীর্ণ করছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রভু এ কী দারুণ লীলা! এত আশ্বাস দিয়ে এ কী ব্যবহার?" তিনি বললেন, "আমি তো মিথ্যা বলি নি। আর কাউকে কি আমি এখানে মারতে দিয়েছি? তবে নিজে মারছি।" তখন ভাবলাম, আর কেউ মারলে তবু কতক মরলেও কতক বাঁচত, আর তুমি যদি স্বয়ং মারো তবে যে সমূলে বিনাশ। এখন কাকেই বা শরণ করি? ধর্মের কথা তো বলাই যায় না, কারণ তাঁকে ছেড়েই তো তোমার শরণ নিয়েছিলাম। হায়, তোমার শক্তি অপরিমিত, কিন্তু এই শক্তির সঙ্গে যে প্রেমের সংযম, তা কই? তুমি দেখছি লাগামহীন আরবী ঘোড়া, ঝোড়ো হাওয়ায় হালহীন পালের জাহাজ। এখন যে সর্বনাশের দিকেই ছুটে চলেছি। এখন কে আমাদের ত্রাণ করবে? কস্ত্রাতা নো ভবিষ্যতি।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের বিপুল তরীর পালে ঝড়ের হাওয়া লেগেছে। বিষম বেগে সে ছুটেছে তীরের মত। আমাদের দেশে আবার জাহাজে শুধু হালই আছে, পাল নেই। তাও ধর্মই কি আছে? নামে মাত্র আজ আমাদের সংযম আছে, শক্তি নেই; ধর্ম আছে, বিজ্ঞানের শক্তি নেই। কাজেই জীবনের গতি অচল রুদ্ধ। অথচ সভ্যতাদীপ্ত সব দেশের জাহাজে বিজ্ঞানের বিপুল বেগ। শক্তিহীন সংযম অর্থহীন, তা শিখণ্ডীর মত। শিখণ্ডীতে ও ভীষ্মে অনেক তফাত। বিজ্ঞানতরীতে ধর্মের হাল বা

সংযম নেই ; শক্তি আছে, সংযম নেই। এর চেয়ে বিপদ আর কি হতে পারে ? এক সময় তাদেরও ছিল ধর্মের সংযম, ছিল না বিজ্ঞানের শক্তি। এখন তাদের আছে শক্তি, নাই সংযম। এর একটিকে ছেড়ে অন্যটিমাত্র নিয়ে তো কাজ চলে না। দগ্ধরথাশ্ব ন্যায়ে [১] এরই ইঙ্গিত দেওয়া আছে। কাজেই ধর্মে ও দর্শনে যদি হরিহরাত্মা হয়, জ্ঞানের রাজ্যে যদি জাতিভেদ ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবিচার না থাকে তবে তা-ই ভালো। ভারতে যে তার সুদিনে দর্শনে-ধর্মে বিরোধ ছিল না, তা খুবই বড় কথা। ধর্ম ও দর্শন দুয়েরই মূলে সত্য এবং দুইই পরস্পরসাপেক্ষ ও পরস্পরসম্বদ্ধ।

সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের মূলে যে সত্য সেই সত্যেই সমস্ত বিশ্বজগৎ বিধৃত, তাই সত্যের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানেরও শ্রেষ্ঠতা।

সত্যে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তস্মাৎ সত্যং পরমং বদন্তি। [২]

এই অভেদদর্শনই জ্ঞান এবং জ্ঞানও হল সেই অভেদদর্শন। দর্শন তাকেই বলে যা সমস্ত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্যের যোগটি দেখতে পায়

অভেদদর্শনং জ্ঞানম্। [৩]

(১) এক রাজা বনে গেলেন মৃগয়ায়। দাবানলে তাঁর ঘোড়া পুড়ে গেল। আর এক রাজার পুড়ে গেল রথ। বনের দুই দিকে দুইজন রাজা নিরুপায়। একের আছে ঘোড়া। সে-ঘোড়া রথের ঘোড়া, তাতে সওয়ার হওয়া চলে না। অন্যের আছে রথ, ঘোড়া নেই। দুই রাজায় দেখা হল। একের ঘোড়া অন্যের রথে জুড়ে উভয়ে বন হতে জনপদে এসে বাঁচলেন। এরই নাম দগ্ধরথাশ্বন্যায়। দেহ ও আত্মায় যোগকে এই ভাবেই তত্ত্ববিদেরা বুঝিয়েছেন।

(২) মহানারায়ণ উপনিষদ ২২, ১॥ (৩) স্কন্দ উপনিষদ ১১॥

সেই সত্য সর্ববন্ধনমুক্ত।

সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনঃ। ১

এই সত্যই তপস্যা, সেই তপস্যাই ধর্ম।

ঋতং তপঃ, সত্যং তপঃ। ২

যাকে সবাই অমৃত বলেন এই সত্য দিয়েই তা আচ্ছাদিত।

এতদমৃতং সত্যেন ছন্নম্। ৩

যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্ন করলেন, "সমস্ত ধর্ম ও দীক্ষা কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত?" নিজেই উত্তর দিলেন, "সত্যের উপর।"

কস্মিন্ নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা? সত্য ইতি। ৪

মুণ্ডকোপনিষৎ তাই বললেন, "ধর্মের দেবযান পথ সুদূরে চলে গিয়েছে এই সত্যের উপর দিয়েই।"

সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। ৫

কাজেই আমাদের দেশে প্রাচীন গুরুদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল যাতে ধর্ম ও দর্শন সত্য হতে ভ্রষ্ট না হয়। কাজেই বিজ্ঞান-দর্শন ও ধর্ম এদেশে পরস্পর যুক্ত ও সমন্বিত। Inquisition এর কল্পনা এই দেশে কখনও হয় নি। কেননা বিশ্বসত্যের অর্থাৎ বাস্তববাদের (Realism এর) সঙ্গে এদেশে দর্শনের বা ধর্মের (Idealismএর) বিরোধ কখনও ছিল না। তাই সমস্ত বুদ্ধদেবের মূর্তিতেই দেখা যায় উপদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে তিনি ভূস্পর্শ করে দেখাচ্ছেন যে "এই পৃথিবীর সমস্ত সত্য আমার কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।" তারই নাম হল 'ভূস্পর্শ মুদ্রা'। বিশ্বসত্যের উপর কতখানি শ্রদ্ধা থাকলে এমনটি হয়! এই বিশ্বসত্যের খাতিরেই প্রত্যেকবার গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণের পূর্বে ব্যাহৃতি বলতে হয় "ভূর্ভুবঃস্বঃ"। সর্বলোকের

---

(১) নৃসিংহ উত্তর তাপনী ৯॥ (২) মহানারায়ণ উপনিষদ ৮, ১॥ (৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১, ৬, ৩॥ (৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩, ৯, ২৩॥ (৫) মুণ্ডকোপনিষদ ৩, ১, ৬॥

সত্যের সঙ্গে যুক্ত করে ক্ষুদ্র-সব সীমার অতীত হয়ে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। এর চেয়ে রিয়্যালিজ্‌ম্‌ আর কি হতে পারে?

আমাদের দেশের দর্শন ও সাধনা এই বিশ্বসত্যেরই উপর প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা চিরদিন করেছে।

পরম সত্যের সন্ধান

ভারতবর্ষের সত্যানুসন্ধানে আর একটি অপূর্ব জিনিস আছে যা আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। এদেশে জ্ঞান-সাধকেরা সত্যানুসন্ধানের খাতিরে যুক্তিতে বিচারে যতদূর চলে যেতে হয় ততদূরই নির্ভয়ে চলে গেছেন, সীমালঙ্ঘনের ভয়ে মাঝপথে কোথাও থামেন নি। য়ুরোপে বিচারের সময় তাঁদের চারিদিকে সব মতবাদের (creed এর) বেড়া থাকে। এদেশে সে বালাই নেই। 'পূর্বমীমাংসা'র আসল কথাই হল বৈদিক দেবতা ও যাগযজ্ঞের ব্যাখ্যা। যুক্তিতর্কে ক্রমে দেবতারা সব উড়ে গেলেন। তখন তাঁরা বললেন, "দেবতারা না হয় না-ই থাকুন তবু এই সব কর্ম করলে যে 'অপূর্ব' হয় তাতেই কাম্যসিদ্ধি ঘটবে।" জ্ঞানের বিশ্লেষণে সর্বত্রই যুক্তিবিচারে যতদূর চলতে হয়েছে ততদূর তাঁরা নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন। আসলে এঁদের যে সত্যই দেবতা, সত্যই ধ্যেয়, সত্যই তপস্যা, সত্যই সাধনা। সত্যকে পাওয়া মানেই ভগবানকে পাওয়া। তাঁ'তে ও সত্যে কোনো ভেদই নেই। বৃহদারণ্যকও বলেন, "সত্য ও তিনি অভিন্ন।"

সত্যং বৈ তৎ।[১]

---

(১) বৃহদারণ্যক ১,৪,১৪ ॥

মধ্যযুগে নিরক্ষর সাধক কবীরও বললেন, "সত্যের সমান তপস্যা নেই, মিথ্যাই হল সেরা পাপ, যাঁর হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত তাঁর হৃদয়ে তিনি স্বয়ং বিরাজমান।"

সাঁচ বরাবর তপ নহীঁ ঝূঠ বরাবর পাপ।
জাকে হিরদে সাঁচ হৈ তাকে হিরদে আপ॥১

ভক্ত সাধক দাদূ (১৫৪৪) বললেন, "সত্যের পথই হল সরল শুদ্ধ পথ, যে হয় সাচা সেই যায় সেই পথে। দাদূ দিলেন দেখিয়ে সেখানে ঝুঠার চলবার যো নেই।"

সূধা মারগ সাচকা সাচা হোই সো জাই।
ঝূঠা কোই না চলে দাদূ দিয়া দিখাই॥২

সত্যের ক্ষেত্রে সদর-মফস্বল নেই। অনেক দেশেই দেখা যায় কতক সত্য শুধু ধর্মজগতের সত্য অর্থাৎ প্রাদেশিক বা parochial সত্য। আমাদের ভক্তরা সত্যের এই প্রাদেশিক স্বরূপটি স্বীকার করেন নি। সাধকশ্রেষ্ঠ রজ্জবজি (১৫৫০) বললেন, "সব সত্যের সঙ্গে যার মিল তাকেই বলি সত্য, তা নইলে সে ঝুটো। চাই রুষ্ট হও কি তুষ্ট হও, দাস রজ্জব এই সত্য গেলেন বলে।"

সব সাঁচ মিলে সো সাঁচ হৈ না মিলে সো ঝূঠ।
জন রজ্জব সাচী কহী ভাবৈ রিঝি ভাবৈ রূঠ॥

ভারতে সত্যের সাধনা

কোনো বিশেষ দিকে পক্ষপাত না করে যে সত্যানুসন্ধান তাই হল ভারতের পথ। ভারতের সংস্কৃতি তো কোনো বিশেষ একটি দলের সৃষ্টি নয়। যুগের পর যুগ কত জাতিই ভারতে এসেছে আর তাদের সংস্কৃতির

(১) কবীর সাখী, সাঁচ, অংগ, ২২॥ (২) দাদূ, সাচ, অংগ, ১৫২

পলির 'পরে পলি পড়ে নদীমুখে বদ্বীপের মত ভারতীয় সংস্কৃতিটি গড়ে উঠেছে। এখানে উচ্চ নীচকে কখনও নিঃশেষ করে নি। সবাই পাশাপাশি বাস করে আপন আপন সাধনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমেরিকাতে য়ুরোপীয়েরা যেমন করে 'মায়া' 'আজতেগ' প্রভৃতি অপূর্ব সব সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করেছে, অস্ট্রেলিয়াতে নিউজিলণ্ডে যেমন করে তারা পুরাতন সব সংস্কৃতিকে নিঃশেষ করেছে তেমনটি ভারতে কখনও ঘটে নি। এই জন্যই ভারতে এত বিচিত্র সাধনা ও সংস্কৃতির সমাবেশ। তাতে ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্য বিশাল হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তাতে সংহতি হয় নি। অথচ সংহতিই হল রাজনীতিক শক্তির মূল। য়ুরোপীয়েরা এদেশকে জাতিভেদ-সমাচ্ছন্ন বলে খোঁটা দেন, আর তাঁরা যে সকলকে নিঃশেষ করে সমস্যার মূলই ঘুচিয়ে দিয়ে তবে সে দায় এড়িয়েছেন সে কথা কে বলে ? আমেরিকাতে দায়ে ঠেকে কাজ করাতে পরে যে নিগ্রোদের তাঁরা নিয়ে গেলেন সেই সমস্যাটুকুই এখনও মেটে নি। আগে তাঁরা সেইটুকু মিটিয়ে তবে যেন এদেশে খোঁটা দিতে আসেন।

যাক, সে-সব কথা আলোচনা করা বৃথা। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে বহু সংস্কৃতির সমাবেশে ভারতের দৃষ্টি হয়েছে উদার। দার্শনিকদের ভাষায় "অন্ধহস্তিন্যায়"। হস্তী কেমন, জনকয়েক অন্ধ তা বুঝতে চাইল। তাদের দেখা মানে ছোঁয়া। যে ছুঁলে কান সে বললে—হাতী কুলোর মত। দাঁত ছুঁয়ে কেউ বললে—হাতী মুলোর মত। ল্যাজ ছুঁয়ে কেউ বললে—হাতী দড়ির মত। পা ছুঁয়ে কেউ বললে—হাতী স্তম্ভের মত। তারা কেউই ভুল বলে নি। বিরাট বিষয়, দেখবার ইন্দ্রিয় সীমাবদ্ধ। যে যেভাবে দেখেছে সে তাই বলেছে। মূল সত্যকে তেমনি ভারতের নানা সংস্কৃতি নানাভাবেই দেখেছে। তাদের কারো দৃষ্টিই মিথ্যা নয়। কাজেই

নানা সংস্কৃতির সমাবেশে ও সমন্বয়ে ভারতের দার্শনিক দৃষ্টিকে উদার হতেই হয়েছে।

ভারতপন্থ ও বাংলাদেশ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বহু জাতির বহু সংস্কৃতি দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই বিশেষ কারো নামে এদেশের সংস্কৃতির বা ধর্মের নামকরণ হতে পারে নি। ভারতে অর্থাৎ "হিংদে" যাঁরা এসেছেন তাঁদের সবারই সৃষ্টি বলে এর নাম ব্যক্তিবিশেষের নামে না হয়ে এই দেশের নামে নাম হয়েছে "হিন্দু" অর্থাৎ ভারতীয়।

সব জ্ঞানধারার মূল যে বেদেই মিলবে তার কোনো মানে নেই। বেদবাহ্য ব্রাত্য ও বেদবিরোধী তৈর্থিকের ধারাও অতি প্রাচীন। আর্যদের যে-সব শাখা ভারতের বাইরে তাদের জ্ঞানধারার সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞানধারার যে-সব বিষয়ে পার্থক্য, তার জন্য ভারত ও ভারতীয় আর্যেতর সব ধারার প্রভাব থাকার কথা।

কবীর তো বললেন শততন্ত্রী বীণার যেমন প্রতি তারে ভিন্ন স্বর, অথচ তার একটি তারও বাদ দিলে চলে না, তাদের সবাকার সমন্বিত স্বরসাধনা চাই। তেমনি ভারতের সর্ব সাধনার সমন্বয়ে পরিপূর্ণ সাধনা। কাউকে বাদ দেওয়া যায় না। তাই তাঁর বিখ্যাত গান—"পংথ বীণা সত ধুন উচারৈ'। সর্বপথের সমন্বয়-বীণার সত্য স্বর উঠেছে বেজে! তাই কবীর ভারতীয় সাধনাকে সমন্বয়-সাধনাই বলেছেন এবং তাই এর নাম দিয়েছেন "ভারতপন্থ"। এখনও তাঁর দলের যুগলানন্দ প্রভৃতি নিজেদের ভারতপথিক বলেই পরিচয় দিয়েছেন।

বহু যুগের নানা বিচিত্র সংস্কৃতির সম্মেলনে ও সমন্বয়ে ভারতীয় দর্শন

যেমন ঐশ্বর্যলাভ করেছে এমন আর কোনো দেশে হয়ে ওঠে নি। আর একটা কারণেও হয়তো চিন্তায় আর্যেরা খুব অগ্রসর হলেন। তাঁরা পূর্বে ছিলেন শীতপ্রধান দেশে। কাজেই তাঁদের আলস্য ছিল না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এসে দেহ পড়ল এলিয়ে, অথচ চিরদিন তাঁরা ছিলেন অনলস। তাই তাঁদের মন চলল কাজ করে। তাই নানা সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁদের মন নানাভাবে কাজ করে বিচিত্র রকমের দার্শনিক সম্পদ রচনা করে তুলতে লাগল।

হাজার হাজার বছরের সেই অপরিমেয় সম্পদের পরিচয় কি করে অল্পের মধ্যে দেওয়া যায়? শুধু নামের তালিকা দিলেও তো চলবে না। গ্রন্থ-টীকা-ভাষ্য বিস্তর আছে, তার অনুবাদ আছে। যত্ন করে দেখলেই হল। যাঁদের সময় কম তাঁদের জন্যও প্রাচীন কাল থেকে বহু মহাপুরুষ সকল দর্শনের সরল সংক্ষিপ্ত সব পরিচয় রেখে গেছেন। হরিভদ্র লিখে গেলেন ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, শংকরাচার্য লিখলেন সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, মাধবাচার্য লিখলেন সর্বদর্শনসংগ্রহ, ফরিদপুর কোটালীপাড়ার মধুসূদন লিখলেন প্রস্থানভেদ। তাছাড়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, সর্বমতসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। বৈষ্ণবমতের জন্য সকলাচার্যমতসংগ্রহ আছে। এখনকার দিনেও দেশী-বিদেশী নানা ভাষায় অনেক বই এইজন্য রচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ভারতের এক সীমায়, তাই বাংলাদেশ জ্ঞানে ও সাধনায় অনেক নতুন কথা বলতে পেরেছে। যাস্ক পাণিনি প্রভৃতি ভাষাশাস্ত্রের আচার্যদের জন্ম কাবুলের কাছাকাছি, যেখানে আর্য ও অন্য ভাষা পরস্পর মিলতে পারায় ভাষার সম্বন্ধে সবার চেতনা হয়েছে। এক পতঞ্জলি হলেন গোনর্দীয় অর্থাৎ মধ্য-ভারতের। আর সব ভাষাতত্ত্ববিদ্ হলেন ভারতীয় সীমান্তপ্রদেশের লোক। দর্শনেও যেখানে নানা ধারায় মিল হয়, সেখানে দার্শনিক সব আচার্যদের অভ্যুদয় হয়। তাই কপিল গঙ্গা-

সাগরসংগমবাসী। শংকরাচার্য, রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি সব দক্ষিণদেশীয়। সবাই সীমান্তপ্রদেশবাসী।

সারা ভারতের কথা না বলে শুধু বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে তারই পার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সারা ভারতের সাধনায়ও বাংলাদেশ কম কাজ করে নি। বাংলাদেশের নিজস্ব যে সাধনা ও বিশেষত্ব সে কথা বলবার আগে সারা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ যে সাধনা করেছে তার সামান্য একটু নামমাত্র করে যাব।

দর্শনের প্রাচীনতম পরিচয় বেদে। তখনও বাংলাদেশে আর্য-উপনিবেশ হয় নি। আর্যপূর্ব সভ্যতা ও দর্শন যা ছিল তার পরিচয় বেদে মেলে না। তবে তখন বাংলাদেশে যোগমত, তন্ত্রাচার, দেহসাধনা প্রভৃতি থাকবারই কথা। পরে বাংলার কাছেই বেদবিরোধী জৈন ও বৌদ্ধমতের উদ্ভব হল যেখানে, সেখানকার সঙ্গে বাংলার যোগ তখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। একান্নবর্তী পরিবারের মত বাংলা-মিথিলাদি প্রদেশ তখন এক হয়েই ছিল। উপনিষদের চিন্তায় মিথিলার বড় স্থান আছে। পরে বাংলাতে বেদ ও বৈদিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রচারও ঘটেছিল। সে কথা এ প্রসঙ্গে বলবার নয়। ভারতের দার্শনিক পথে বাংলাদেশ কারো চেয়ে কম যোগ্যতা দেখায় নি। বাংলাদেশ ভারতেরই এক বিশেষ অঙ্গ। কাজেই সারা ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে বাংলারও সাধনা থাকবেই। সেই সব ক্ষেত্রেই বাংলার যথেষ্ট দান বহু গ্রন্থে আজও জীবিত রয়েছে। কিন্তু তবু তার নিজেরও একটি বিশিষ্টতা ও বিশেষ দান আছে। সে কথাতেই ক্রমে আসছি।

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে পূর্বমীমাংসার আগাগোড়াই বেদ নিয়েই কারবার। পূর্বমীমাংসার দুইটি ধারা। কুমারিলের ধারা রক্ষণশীল, প্রভাকরের ধারা উদার। বাংলাদেশে গৌড়মীমাংসক শালিকনাথ (৭ম শতক) ছিলেন

প্রভাকরী মতের। কুমারিল-মতেও ভবদেব ভট্ট (১২শ শতক) যে অপূর্ব গ্রন্থ তৌতাতিতমততিলক রচনা করে গেছেন, তার সম্মান আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এঁরা ছাড়া হলায়ুধ (১২শ শতক), রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৫শ), রঘুনাথ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বিস্তর পণ্ডিত এই ক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন।

উত্তরমীমাংসায় বা বেদান্তে একা মধুসূদন সরস্বতীই একশত। সর্বশাস্ত্রের তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিগ্রহ। তাঁর কথা আগেই বলেছি। এই মধুসূদন শেষজীবন কাটিয়েছেন কাশীতে। এঁর পাণ্ডিত্যের কথাই সবার আছে জানা, এঁর আর-একটি দিকের খবর অনেকে রাখেন না।

তুলসীদাস যখন কাশীতে এসে তাঁর রামচরিতমানস বা রামায়ণ রচনায় রত তখন কাশীর পাণ্ডা ও মোড়লেরা তুলসীদাসকে উদ্বাস্ত করে তুললেন। কাশী না ছাড়লে তুলসীদাসের উপায় নেই। এই যখন তাঁর মনের ভাব তখন কি করে মধুসূদন তা জানতে পারলেন। তুলসীদাসকে তিনি একটি শ্লোক লিখে পাঠালেন, "কাশীর নাম আনন্দকানন। সেই কাননে একমাত্র জঙ্গমতরু তুমি তুলসী। তোমার কবিতামঞ্জরীইতো রামভ্রমরে ভূষিতা। তুমি কাশী ছাড়বে কেমন করে?[১]"

"আনন্দকাননে কাশ্যাং তুলসী জঙ্গমস্তরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষিতা॥

ফলে তুলসীদাস কাশীতেই রয়ে গেলেন। রামায়ণ সমাপ্ত হল। হিন্দী ভাষায় অপূর্ব তুলসী-রামায়ণের মূলে পূর্ববঙ্গ কোটালীপাড়ানিবাসী এই ব্রাহ্মণের উৎসাহ যে কতখানি কাজ করেছে তার খবর কজনে রাখেন? মধুসূদন যেখানে বৈদান্তিক সেখানে তিনি ভারতীয়, যেখানে তিনি ভক্ত সেখানেই তাঁর গৌড়ীয় বিশিষ্টতাটিই ধরা পড়ে।

মধুসূদন ছাড়াও অদ্বৈতবেদান্তে বাংলাদেশে মহেশ্বর, বাসুদেব

(১) রামনরেশ ত্রিপাঠী, রামচরিতমানস, তুলসীজীবনী, ৯৮ পৃষ্ঠা॥

সার্বভৌম, গৌড় পূর্ণানন্দ, গৌড় ব্রহ্মানন্দ, নন্দরাম, রামানন্দ, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি বড় বড় সব আচার্য হয়ে গেছেন। কত নাম আর করব ?

সাংখ্যের প্রবর্তক কপিলের আশ্রম নাকি ছিল গঙ্গাসাগরসংগমে। গঙ্গাসাগর তো বাংলাদেশেই। কাজেই সাংখ্যদর্শনের সাধনায় বাংলাদেশের কি বিশেষ কোনো দাবি নেই ? বাংলাদেশ যখন মগধাদি প্রদেশের সঙ্গে একান্নপরিবারের অন্তর্গত তখনই তার কাছাকাছি জৈন বৌদ্ধাদি যাগযজ্ঞবিরোধী মত প্রবর্তিত হয়। মগধ-বাংলা বোধ হয় যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী ছিল না বলেই ঐতরেয় আরণ্যকে পাখি বলে বাঙালী ও মগধবাসীদের গালাগালি করা হয়েছে।

তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।[১]

তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গ ছাড়া বঙ্গমগধে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, এই ছিল বেদপন্থীদের বিধান। বুদ্ধ, মহাবীর উভয়েই বেদবিরোধী। কপিলও যাগযজ্ঞকে বড় স্থান দেন নি। তাঁর ধারাতে ক্রমে আসুরি, পঞ্চশিখ, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি আচার্যদের নাম পাই।[২] তর্পণকালে আমরা এঁদেরও তৃপ্তি কামনা করি—

কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।[৩]

ঈশ্বরকৃষ্ণ তো তাঁর কারিকার আরম্ভেই বললেন,—দুঃখনিবৃত্তির কাজে বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রত্যক্ষ উপায় বটে কিন্তু তাতে অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও তারতম্য দোষ আছে, কাজেই তার চেয়ে বিপরীত (প্রকৃতি-পুরুষের) জ্ঞানের পথই ভালো।

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥৪

---

(১) ২,১,১,৫ ॥ (২) সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বাচস্পতিমিশ্রের প্রণতি ॥
(৩) হিন্দুসৎকর্মমালা ১ম, ছঃ ১৬ ॥ (৪) দ্বিতীয় কারিকা ॥

বাচস্পতি মিশ্র এই উপলক্ষ্যে পঞ্চশিখাচার্যের যে একটু বচন উদ্ধৃত করেছেন তা তো আরো ভয়ংকরভাবেই যাগযজ্ঞকে আঘাত করছে। পঞ্চশিখ বললেন,

স্বল্পসংকরঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ।

অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্গে মেশানো আছে হিংসা প্রভৃতি পাপ, তাই সে-সব অনর্থের জন্যও চাই প্রায়শ্চিত্ত। নইলে সে-সব পাপের জন্য দুঃখবহ্নিতে দগ্ধ হতেই হবে। সাংখ্য তাই যাগযজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভের চেয়ে প্রকৃতিপুরুষ জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলেছেন। বাংলার বিশিষ্টতার সঙ্গে এর মিল আছে।

বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ছিলেন সাংখ্যসূত্রের প্রখ্যাত টীকাকার। রঘুনাথ তর্কবাগীশের সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ হল ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার টীকা। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সাংখ্যকৌমুদীও তাই। রামানন্দ লেখেন সাংখ্য-পদার্থমঞ্জরী। এঁরা সবাই বাঙালী। বাংলাদেশের নানাবিধ সাধনার সঙ্গেই সাংখ্যমত জড়িয়ে আছে।

যোগদর্শনে যেমন পতঞ্জলির মত দেখা যায় তেমনি নাথনিরঞ্জন প্রভৃতি অতি পুরাতন সব মতে কায়াসাধনের কথা আছে। আদিনাথ, মীননাথ, গোরখ, ময়নামতী, গোপীচাঁদ প্রভৃতি এই পথের গুরু। সেই সবই বাংলার নিজস্ব যোগমত। নাথগুরুদের গ্রন্থ এখন দুর্লভ। তবে মহাযান বৌদ্ধমতের মধ্যে দোহাকোষে গোরখ, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি কথায় বাউলদের গানে সেই যোগমতের অনেক পরিচয় এখনও মেলে। এই পথেই বাংলাদেশের যোগমতের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নানা সংস্কৃতির মিলনে মানুষের বুদ্ধিবিচার বাড়ে। বাংলাদেশে অনেক সংস্কৃতির মিলন হয়েছিল বলে এখানে বিচারবুদ্ধিরও অনেক উৎকর্ষ হল। তাই বাংলাদেশে হেতুশাস্ত্র ও ন্যায়বৈশেষিক প্রভৃতি

নানা যুক্তিবাদের উন্নতি দেখা গেছে। বাংলাদেশ এইজন্য চিরদিনই শাস্ত্রের চেয়ে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে বেশি মেনেছে। তাই বাংলার বাইরে বাংলাদেশের বদনাম 'হুজ্জতে বঙ্গালা'—তার্কিক বাংলাদেশ।

ন্যায়-বৈশেষিক লবকুশের মত যমজ ভাই। বৈশেষিক দর্শনে শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী একখানা মহাগ্রন্থ। দক্ষিণরাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামে ছিল শ্রীধরের নিবাস। বৈশেষিক মতের সাধনায় আরও বাঙালী পণ্ডিত আছেন। আর নব্যন্যায়ে তো বাংলার স্থান বহুকাল হতে আজ পর্যন্ত সারা ভারতে সবার অগ্রগণ্য হয়েই রয়েছে। বাসুদেব, রঘুনাথ, হরিদাস, জানকীশর্মা, রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণদাস, গুণানন্দ, মথুরানাথ, রুদ্রবাচস্পতি, জগদীশ, ভবানন্দ, হরিরাম, বিশ্বনাথ, রামভদ্র, রঘুদেব, গঙ্গাধর, নৃসিংহ, পঞ্চানন, রামরুদ্র, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, জয়রাম, রুদ্ররাম, কৃষ্ণকান্ত, কালীশংকর প্রভৃতি প্রত্যেকে এক-একটি দিক্‌পাল। কার নাম রেখে কার নাম বলি? কাশীতেও চন্দ্রনারায়ণ, কৈলাস শিরোমণি, রাখালদাস, বামাচরণ প্রভৃতি বাঙালীরা স্বদেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন। সেদিনও সেখানে বিরাজমান ছিলেন প্রমথনাথ প্রভৃতি সব মহাপণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ছিলেন আমার সতীর্থ। অকালে তাঁরা চলে গেলেন। বাংলার যে কি বিষম ক্ষতি হল তা জানেন সংস্কৃতের পণ্ডিতেরা। যাঁরা তা জানেন না তাঁদের সে কথা বুঝিয়ে বলা কঠিন।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এবং প্রাচ্যপাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনে বিখ্যাত যেসব বঙ্গীয় পণ্ডিত তাঁদের নাম এখন অনেকেরই সুপরিচিত। ব্রজেন্দ্র শীল প্রভৃতি বঙ্গীয় পণ্ডিতদের লেখা সর্বত্র সম্মানিত। সারা ভারতের সাধনায় ও সারা জগতের সাধনায় এঁরা আপন আপন সাধনার অঞ্জলি ভালো করেই দিয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের জৈনবৌদ্ধমত

পূর্বেই বলেছি, সেই অতি প্রাচীন যুগে জৈন ও বৌদ্ধমত বাংলার পাশেই জন্মেছে। জৈনমতের সব জ্ঞান চলে আসছিল মুখে মুখে। মহাবীর পর্যন্ত আচার্যেরা তীর্থংকর, তারপর চারজন শ্রুতকেবলী। শেষ শ্রুতকেবলী হলেন ভদ্রবাহু। তিনি ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু। তাঁর জন্ম উত্তরবঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধনের কোটপুর বা বর্তমান দেবীকোটে। তিনিই সর্বপ্রথম জৈনশাস্ত্রগুলি একত্র করে প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনী পাই রত্ননন্দীর ভদ্রবাহুচরিতে ও হরিষেণের বৃহৎকথাকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে। তাতে প্রসঙ্গক্রমে তখনকার দিনের বাংলাদেশের অনেক খবরও পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতে জৈনধর্ম তিনিই নিয়ে যান।

বৌদ্ধদের হীনযান মতের চেয়ে মহাযান মতই বাংলাদেশের বেশি নিজস্ব। বহু মহাযান আচার্য বাংলাদেশেই জন্মেছেন। তত্ত্বসংগ্রহরচয়িতা শান্তরক্ষিতও ৭০৫ খ্রীস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় সাভারে জন্মগ্রহণ করেন। নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ এবং য়ূয়ানচুয়াংএর গুরু শীলভদ্রও ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। বিক্রমশীলা-বিহারপতি তিব্বতের ধর্মগুরু দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ ৯৮০ খ্রীস্টাব্দে বিক্রমপুরের এক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। চর্যাপদে ও দোহাকোষে বহু বাঙালী আচার্যের নাম পাই। তাঁদের লেখার মধ্যে বাংলাদেশের বিশিষ্টতা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

হীনযান মতের আচার্যদের মধ্যে সিংহলীয় পণ্ডিত রাহুলের শিষ্য রামচন্দ্র কবিভারতীর নাম ভুলবার নয়। বরেন্দ্রদেশের চিরবাটিকা গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রে তাঁর জন্ম। এখনও এই বুদ্ধাগমচক্রবর্তী রামচন্দ্রকে সিংহলের লোকে পূজা করে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনে দিল্লীতে যখন বেরন জয়তিলকের সঙ্গে কথাবার্তা হল তখন দেখলাম রামচন্দ্রের

গ্রামের কথা জানবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। তিনি বললেন, "রামচন্দ্র কবিভারতী আমাদের গুরুস্থানীয়, তাঁর বিষয়ে কোনো কথাই আমাদের উপেক্ষণীয় নয়। সম্ভব হলে বরেন্দ্রভূমের চিরবাটিকাগ্রামে তীর্থযাত্রায় যেতাম। তবে আমি বৃদ্ধ, অশক্ত।" তার পরেই জয়তিলক মারা গেলেন।

বাংলাদেশের শৈবমত

শৈবদর্শন ও শৈবধর্ম প্রচারেও বাঙালীরা কম কাজ করেন নি: এখন তো দক্ষিণ-ভারতই শৈবধর্মের প্রধান আড্ডা। এক সময় বাঙালীরা সেখানে ছিলেন রাজগুরু। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সময়েই গৌড়দেশ হতে বহু শিবাচার্য সেই দেশে নীত হন। ১১২২ খ্রীস্টাব্দে নরপতি বিক্রম চোলের গুরু ছিলেন বঙ্গীয় শ্রীকণ্ঠশিব। ১১৬৮ খ্রীস্টাব্দে নৃপতি উমাপতি দেবের গুরু জ্ঞানশিবও ছিলেন দক্ষিণ-রাঢ়ের লোক। ১১৮২ খ্রীস্টাব্দে রাজগুরু শ্রীকণ্ঠশম্ভু সে দেশে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনিও দক্ষিণ-রাঢ়বাসী। ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দের লেখে জানা যায় সম্রাট তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গদেবের গুরু ছিলেন শ্রীকণ্ঠপুত্র সোমেশ্বর। একবার শৈবমতের মঠগুলির বিষয়ে সম্রাট একটা পরোয়ানা তৈয়ার করেন। সেই পরোয়ানাটা সংগত নয় বলে সোমেশ্বর তা নাকচ করে দেন। সম্রাট পরে নিজে আপন মতটা অন্যায় বুঝতে পেরে তা প্রত্যাহার করেন। ১২৬২ খ্রীস্টাব্দের মালকাপুর শিলাশাসনে পাওয়া যায়, রাজা গণপতি ও রুদ্রাম্মার গুরু ছিলেন দক্ষিণ-রাঢ়বাসী শিবাচার্য বিশ্বেশ্বর। রাজাদের কাছে যা পেয়েছিলেন তিনি নানা সৎকার্যে তা দান করেন। তার মধ্যে নারীদের জন্য আরোগ্য-শালা ও প্রসূতিশালাও ছিল। তখন আর কোনো দেশে মাতৃমন্দির বা প্রসূতিশালার কথা চিন্তারও অগোচর ছিল।

এই সব নাম ছাড়া দক্ষিণ-ভারতে সোমনাথ, শ্রীকণ্ঠদেব, বামদেব, মহাগণপতিভট্ট প্রভৃতি বড় বড় বাঙালী শিবাচার্যদের নাম পাই।

ধর্ম ও দর্শন

সমস্ত বাংলাদেশে কি ভারতের অন্যত্র যেখানেই দেখি কোথাও দর্শন ছাড়া ধর্ম নেই, ধর্ম ছাড়া দর্শন নেই। বাইরে যা সত্যের বীজ তাই জীবনের ক্ষেত্রে বসিয়ে দিলে হয়ে দাঁড়ায় জীবন্ত ধর্ম। বীজ যে জীবন্ত তার প্রমাণ তো ক্ষেত্র ছাড়া হবার জো নেই। জীবনের সঙ্গে সত্যের নিত্যযোগ। তাই সত্যকে জীবনের ক্ষেত্রে ধর্মরূপে গ্রহণ করে অতি সাবধানে পরখ করে নিতে হয়। এই পরখ করার পদ্ধতি এবং পরখ করে পাওয়া সত্যই হল দর্শন। জীবনের সত্য স্বচক্ষে দেখে পরখ না করে নিলে চলবে কেন? কাজেই ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

'দর্শন' কথাটি খাসা, কিন্তু চোখে দেখাকেই সেরা পরখ মনে করলে চলবে না। যিনি পরখ করবেন তিনি তো বাইরের ইন্দ্রিয় নন। চোখ কান প্রভৃতি বাইরের ইন্দ্রিয় তার দাসদাসী। দাসদাসীর কাছে খবর নিয়ে কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? 'প্রত্যক্ষ' ও হল অক্ষিতে দেখা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা দাসের কাছে খবর পাওয়া। তাই দর্শনের প্রধান কথা 'প্রত্যক্ষ' নয়। তাঁদের সেরা পরখ হল 'অপরোক্ষানুভূতি' অর্থাৎ পরোক্ষ-নয় সোজাসুজি দেখনেওয়ালার এমন এক অপরোক্ষ অনুভূতি। একে ইংরেজীতে immediate বললেও যেন যথেষ্ট বলা হয় না। ভারতের 'দর্শন' কথাটাকে তাই ইংরেজী করতে গিয়ে soul-sight বলা হয়েছে।[১]

(১) Radhakrishnan, Indian Philosophy, Intro, p. 44।

মানবধর্ম

এই অপরোক্ষ দর্শনে দেখব কি? বিশ্বচরাচর? কোথায় এই বিশ্ব-চরাচরের অন্ত? আর তাও তো বাহ্য, দেখতে গেলেও কোনো না কোনো ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বাহিরের দাসদাসীর কথাই শুনতে হবে। উপনিষদের ঋষিরা বললেন, বাইরে যাবার দরকার কি? যা বাইরে আছে তা সবই তোমার মধ্যেও আছে।[১] এসব কথা বেদের প্রথম দিকটায় তো তেমন পাই না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল অনেকটা পরের। তাতে দেখছি লোকে সত্য খুঁজছে। কিন্তু কোথায় সেই সত্যের দেখা মিলবে, তার খবর তখনও মেলে নি। তাই ঋষি বললেন, পেট ভরাবার জন্য মন্ত্র আওড়ালে হবে কি? তোমরা এই সৃষ্টির রহস্য কিছুই তো জান না। সেই রহস্য কি কথার কথা? তা তো অন্ধকারে নীহারে আবৃত।

> ন তং বিদীথ য ইমা জজান
> অন্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
> নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা
> চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥২

এই বিশ্বের যিনি অধ্যক্ষ হয়তো তিনিই তা জানেন, অথবা তিনিও জানেন না।

> যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎ
> সো অংগ বেদ যদিবা ন বেদ ॥৩

অথর্বে দেখতে পাওয়া গেল, পৃথিবী দ্যৌঃ অন্তরীক্ষ সবই এই মানুষের

---

(১) বৃহদারণ্যক ২,৫,১০; ২,৫,১৪ ॥ (২) ঋগ্বেদ ১০, ৮২, ৭ ॥
(৩) ঋগ্বেদ ১০,১২৯,৭ ॥

মধ্যে।[১] মানুষের মধ্যেই মৃত্যু ও অমৃত, তার শিরায় শিরায় স্পন্দিত হচ্ছে সব সমুদ্রের উচ্ছ্বাস।[২] তপস্যা, শ্রদ্ধা, সাধনা সবই এই মানুষেরই মধ্যে।[৩] ঋক্, যজু, সাম সবই এই মানুষের মধ্যে।[৪] ভূত ভবিষ্যৎ সর্বকাল সর্বলোক সবই এই মানুষে।[৫] ব্রহ্মও মানুষেরই মধ্যে। মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্মকে দেখল সেই তাঁকে ঠিক জায়গাটিতে সংস্থিত দেখল।[৬]

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদু
স্তেবিদুঃ পরমেষ্টিনম্ ॥

ছান্দোগ্য বললেন, 'এই সবই ব্রহ্ম'—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।[৭] বৃহদারণ্যক বললেন, 'এই আত্মাই ব্রহ্ম'—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।[৮] মোট দাঁড়াল এই আত্মাই বিশ্বচরাচর ও ব্রহ্ম।

এইসব কথা তো বেদের প্রথম দিকে দেখি না। বেদপন্থীরা যতই এদেশে বসবাস করতে লাগলেন ততই এইসব কথা তাঁদের মুখে বেশি করে শোনা যেতে লাগল। বেদের প্রথম দিকে দেবতাদের নিয়েই কারবার। অথর্বেই মানুষ ও পৃথিবীর দিকে সকলে শ্রদ্ধার সহিত তাকালেন। অথর্বের দশম কাণ্ডের দ্বিতীয় সূক্তের ৩৩টি ঋক্ এই মানুষেরই স্তবগান। দশম কাণ্ডের সপ্তমে ৪৪টি ঋকে বিশ্বরহস্যের সঙ্গে মানবের যোগের মহিমারই কথা। অথর্বের পঞ্চদশ কাণ্ডটা আগাগোড়া ব্রাত্য অর্থাৎ ধর্মকর্মহীন সহজ মানুষের স্তবগান। অর্থাৎ ধার্মিক বলেই মানুষ শ্রদ্ধেয় নয়, মানুষ বলেই মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র। অথর্বের দ্বাদশ কাণ্ডের প্রথম সূক্তের ৬৩টি ঋকে শুধু পৃথিবীরই মহিমা ঘোষিত হল। এখনকার দিনে বেদের দেবদেবীদের কথার চেয়ে এইসব দিকেরই মূল্য অনেক বেশি। অথচ অথর্ব-বেদটাকে সেকালের অনেক দেবপন্থীর দল আমলই দিতে

---

(১) অথর্ব ১০,৭,৩। (২) অথর্ব ১০,৭,১৫॥ (৩) অথর্ব ১০,৭,১। (৪) অথর্ব ১০,৭,২০। (৫) অথর্ব ১০,৭,২২। (৬) অথর্ব ১০,৭,১৭। (৭) ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩,১৪,১॥ (৮) বৃহদারণ্যক ২,৫,১৯।

চান নি। কাজেই মনে হয় মানুষের ও জগতের মাহাত্ম্যবিষয়ক কথা বৈদিকদের নিজস্ব নয়। এদেশে এসে তাঁরা এইসব পেয়েছেন ও ক্রমে তা আত্মসাৎ করেছেন। ক্রমে এইসব কথা উপনিষদে স্থান পেল। এদেশের নাথ যোগপন্থে নিরঞ্জনপন্থে, এইগুলিই হল আসল কথা। মহাযান বৌদ্ধধর্ম থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের সন্ত ও এখনকার বাউলদের মধ্যে এইসব তত্ত্বই বরাবর চলে আসছে।

জৈন ও বৌদ্ধদের মতেও দেবতার স্থানে মানুষই বসলেন পূজ্য হয়ে। মানববৃত্তিগুলি বিশুদ্ধ করাই হল ধর্মসাধনা। সেই সব জৈন বৌদ্ধ মতবাদও বাংলারই আশপাশের বস্তু। বেদের সঙ্গে তাদের চিরবিরোধ। আর নাথযোগ, মহাযান প্রভৃতি মত বেদের ধার ধারে না অথচ সেইসব মতবাদই হল বাংলার চিরন্তন বস্তু। বাংলাদেশ থেকেই এইসব বিচার ও যুক্তি হয়তো চারিদিকে বিস্তৃত হয়েছে। আর সবাইকে এইসব জিনিস দিয়ে বাংলাদেশও ধন্য হয়েছে। বাংলার নাথধর্মে মহাযানধর্মে তান্ত্রিকধর্মে বাউলধর্মে সব সত্যই মানুষের মধ্যে, তাই কায়াসাধনাই হল প্রধান কথা। বিশ্ব ও বিশ্বের সব সত্যই এই মানবকায়ারই মধ্যে। কায়ার মধ্যেই বিশ্বপতি, কায়ার মধ্যেই তাঁকে পেতে হবে। জৈনদের পাহুড় দোহা ও কবীর প্রভৃতির বাণীও প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মহাযানদেরই বাণী। দোহাকোষ বললেন,—"এই দেহেই গঙ্গা-যমুনা-সাগরসংগম, এখানেই প্রয়াগ-বারানসী, এখানেই চন্দ্র-দিবাকর"।

এত্থু সে সুরসরিজমুনা
এত্থু সে গঙ্গাসাঅরু।
এত্থু পআগবনারসি
এত্থু সে চন্দদিবাঅরু ॥১

(১) দোহাকোষ ১৫,৪৭।

পাহুড় দোহা জৈনদের। মহাযান বৌদ্ধদের মতের মত পরবর্তী জৈনধর্মে কায়াযোগ, প্রেমসাধনা প্রভৃতিই প্রধান হয়ে উঠল। কাজেই আর্যপূর্ব এইসব মতবাদের জোর কতখানি তা বুঝতে পারি। পাহুড় দোহার রচয়িতা মুনি রামসিংহ প্রায় ১০০০ খ্রীস্টাব্দের লোক। পরে কবীরও বললেন,

যা ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর
যাহীমেঁ নদ্দী নারা।
যা ঘট ভীতর কাশী দ্বারকা…
যা ঘট ভীতর চংদ সূর হৈ।১

তাঁরও পরে দাদূ বললেন,

কায়া মাহেঁ সাগর সাত।২
কায়া মাহেঁ নদীয়া নীর।৩
কায়া মাহেঁ গংগতরংগ
কায়া মাহেঁ জমনাসংগ।৪
কায়া মাহেঁ কাসীথান।৫

মহাযান বৌদ্ধদের দোহাতেও দেখি, এই শরীরের মধ্যেই চলেছে অশরীরের গুপ্তলীলা—

অসরির কোই সরিরহি লুক্কো।৬

ভাই সরহপাদ বললেন, 'ঘরেও থেকো না, বনেও যেয়ো না।'

ঘর হি ন থক্কু ন জাহি বনে।৭

কবীরেরও আছে,

না ঘর রহ্যা না বন গয়া না কুছ কিয়া কলেস।

কবীর যে জাতিতে জোলা, অর্থাৎ যোগী নাথের ঘরেই যে তাঁর জন্ম।

বাংলাদেশও দেবতাকে মানবভাবেই তার অন্তরঙ্গ করে নিয়েছে।

(১) কবীর ১, ৮৬। (২) দাদূ, কায়াবেলী ২৪। (৩) দাদূ, কায়াবেলী ২৫। (৪) দাদূ, কায়াবেলী ২৮। (৫) দাদূ, কায়াবেলী ৩০। (৬) দোহাকোষ ২১,৮,৯। (৭) দোহাকোষ ২২,১০৩।

আর এই সাধনার গুরু হলেন বাংলার প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষাহীন সহজ মানুষ।

বাংলাদেশের প্রাকৃত মানবতাধর্ম

২৮ বছর আগে কলিকাতায় দর্শনমহাসভাতে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ এই দেশের প্রাকৃত দর্শন (Philosophy of Our People) বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনিও বলেন, "আমাদের মধ্যে যে সত্য তাতেই এই বিশ্বের সত্যতা।" তাই তিনি বাউল গান উদ্ধৃত করেন—

আমার আঁখি হইতে পয়দা
আসমান আর জমীন।

•সেই পরাৎপর পরমপুরুষও আমারই মধ্যে আছেন—

রূপ দেখিলাম রে
নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিল আমারে॥

অক্সফোর্ডে তাঁর হিবার্ট্ লেকচার্ও বাউলদের কথাতেই পূর্ণ।

বাংলাদেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা। প্রেমই হল ধর্মের প্রাণ। এইসব কথাই বৌদ্ধযুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমানভাবে দেখা যাচ্ছে। এই সব কথাই বাংলার যোগমতে, বাংলার তান্ত্রিক সাধনায়, বাংলার প্রাকৃত গানে চলে আসছে। বাংলাদেশের সাধনার এইটেই প্রাণবস্তু। পরবর্তী সব উপনিষদে যে যুক্তিবিচারের এত স্বাধীনতা তা খুব সম্ভব এইসব মতেরই প্রভাবে। এই স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশকে অন্য প্রদেশের সনাতনপন্থীরা কোনোদিনই ভুচক্ষে দেখতে পারেন নি। অথচ বাংলার বাউলদের এইসবই হল সাধনার মূলতত্ত্ব।

বাংলাতে বৌদ্ধধর্ম এইসবের সঙ্গে মিশে গিয়ে মহাযান হয়ে দাঁড়াল। প্রেমের সাধনায় অনেক দুঃখ অনেক বিপদ আছে, তবু বাংলা তাকেই স্বীকার করেছে, তবু শুষ্ক আচার ও জ্ঞানের পথে যায় নি। সাধকশ্রেষ্ঠ রবিদাসকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'প্রেমের ধর্মে যদি বিকারেরই ভয় তবে সে পথে কেন যাব ?'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাও ?'

উত্তর পেলেন, 'দুধ দই শাক অন্ন খাই।'

আবার প্রশ্ন হল, 'তা কি পচে ?'

উত্তর এল, 'হ্যাঁ।'

রবিদাস বললেন, 'ইঁট পাথর তো পচে না, তা কেন খাও না ?

উত্তর শুনলেন, 'তাতে যে প্রাণ বাঁচে না।'

তখন রবিদাস বললেন, 'ঠিক সেইজন্যই প্রেমের পথে বিপদ থাকলেও সেই পথেই যেতে হবে। তা যে জীবন্ত। শুধু শুষ্ক আচারে ও জ্ঞানে বিকারের ভয় না থাকলেও যাতে প্রাণ নেই তাতে প্রাণ তো বাঁচে না। জীবন্ত মানুষ জীবন্ত প্রেম ছাড়া বাঁচবে কেমন করে ?'

কবীর দাদূ সবাই বলেছেন—

> জীব বিনা জীব বাঁচে নহি
> জীবকা জীব আধার।

সংস্কৃতির যোগাযোগ

বেদের প্রথম দিকে যা দেখি তা হল ইন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞ, তাতে করে আমরা ইহলোকে পাই ধনজন গো-অশ্ব ও শস্য-সম্পদ এবং পরলোকে পাই স্বর্গ। সুখ সম্পদ প্রভৃতির

জন্য লড়বার মত শক্তিও তাঁদের কাম্য। তাঁদের যাগযজ্ঞের চারিদিকে দেখা যেত গান-বাজনা-উৎসবের সমারোহ। সে যুগে সন্ন্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতির ধার তাঁরা ধারেন নি। ধর্মের জন্য পশুঘাতও তাঁদের বেশ চলত। ক্রমে উপনিষদের যুগে দেখি দেবতার স্থানে আত্মা পরমাত্মা ব্রহ্ম প্রভৃতির তত্ত্ব বড় হয়ে উঠল। সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হল। ধনজনের কামনার স্থানে এল বৈরাগ্য, স্বর্গের বদলে ক্রমে তাঁরা চাইলেন মুক্তি। ধর্মার্থ পশুঘাতের স্থলে এল অহিংসা মৈত্রী। মানুষ ও মানবদেহের মহত্ত্ব, মানবের মধ্যে বিশ্বপ্রেমে ভক্তিতে সাধনা প্রভৃতি দেখা দিল। এসব জিনিস হয় এদেশে আগে থেকেই ছিল, নয়তো এদেশে এমন সব মতবাদ ছিল যার সঙ্গে যোগে বা সংস্কৃতির যোগাযোগের ফলে তাঁদের মনে ঐ সব ভাব এল।

কিন্তু নানা কারণে মনে হয় আর্যপূর্ব কোনো কোনো উন্নত দলে এইসব বড় তত্ত্ব ছিল। আবার কোনো কোনো অনুন্নত দলে ভূত প্রেত প্রভৃতি স্থূল বস্তুর পূজা তুকতাক অভিচার প্রভৃতি অনেক নিকৃষ্ট জিনিসও ছিল। আর্য-অনার্য মিলনের ফলে উভয়ের ভাল ও মন্দ দুইই মিলে মিশে গিয়েছে। মোটের উপর এই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বিচারবৈচিত্র্য ও পরস্পরের মিলন ঘটেছে।

আর্যেরা এলেন উত্তরপশ্চিম-ভারতে। তাই আর্যপূর্ব সংস্কৃতিকে সরতে হল হয় পূর্বদিকে নয় দক্ষিণে। পূর্বদেশে আর্যপূর্ব বহু সংস্কৃতি এসে স্থান পেল। সেইগুলিই পরে জৈনধর্মের সঙ্গে মিলে গেল এবং পাহুড় দোহা প্রভৃতি মরমী মতবাদের সৃষ্টি হল। মহাযান বৌদ্ধধর্মেও দেখা গেল মানুষই সব, দেহেই বিশ্বচরাচর। প্রেমেই সাধনা, দেহকর্ষণ ব্যর্থ, কায়াযোগই সাধনীয়, বাহ্য-দেবতা মন্দির পূজা সবই ব্যর্থ, বাহ্য-আচার সম্প্রদায় সবই নিষ্ফল। এসব মতবাদ বেশি করে ছিল এই বাংলা দেশেই। বাংলার নাথ-যোগীদের মধ্যে এই সব মতই চলে আসছিল।

কবীর প্রভৃতির ধারাও এই দলের। নাথ-যোগীরা নামেমাত্র মুসলমান হয়ে জোলা ব'নে গিয়েছিলেন। জোলা শুধু একটা জাত নয়; তখন জোলা বলে সাধক-সম্প্রদায়ও ছিল। তাই তুলসীদাস ব'লে গেছেন—

ধূত কহৌ অবধূত কহৌ রজপুত কহৌ
জোলহা কহৌ কোউ ॥১

এখনও কাশী-প্রদেশে ভর্থরী নামে এক সম্প্রদায় আছে। তারা নাকি ভর্তৃহরির অনুবর্তী যোগী-সম্প্রদায়। অথচ এখন নামে তারা মুসলমান। আবার হিন্দুদের কোনো উৎসবই তাদের গান ছাড়া সম্পন্ন হয় না।

কায়াযোগ ও প্রাকৃত পথ সহ এইসব মরমীবাদই বিশেষ করে বাংলার নিজস্ব। শুধু মহাযানে নয়, খুব শেষের দিকের উপনিষদ্‌গুলিতেও এরই পূর্ণ প্রভাব। এগুলিই এদেশের নিজস্ব বলে এর শক্তি এত বেশি যে পরে বাইরে থেকে যত ধর্ম এসেছে সবাইকে ক্রমে ক্রমে এইসব মরমী মত মেনে নিতেই হয়েছে।

ভূমির সঙ্গে যোগ থাকায় এর জোর এতই বেশি ছিল যে এরই প্রভাবে ক্রমে বৈদিক ধর্ম হল উপনিষদের কায়াযোগবাদী প্রাকৃত ধর্ম। জৈন-মতের ক্রমে পরিণতি হল সেই জাতীয় পাহুড় দোহা প্রভৃতি মতে। পরে স্থানকবাসী ঢুংঢিয়া লুঙ্কাশাহমত—তারণপন্থ প্রভৃতি জৈন মতেও এর প্রভাব দেখা যায়। বৌদ্ধমতের সঙ্গে এই মত মিলে হল মহাযান, বজ্রযান প্রভৃতি সম্প্রদায়।

বাংলাদেশের শৈব ও শাক্ত ধর্ম

শৈবমত বাংলাতে বজ্রযানের সঙ্গে মিলে মিশে ছিল। এখনও বাংলায় পার্থিব শিবের মধ্যে বজ্রযানীদের স্তূপের রূপ দেখা যায়। বাংলা

(১) রামচরিতমানস, রামনরেশ ত্রিপাঠী, তুলসীজীবনী পৃ. ২১।

দেশে মাটির তৈরি শিবের মাথায় একটি মাটির গুলি দেওয়া হয়। তার নাম বজ্র। বেলপাতা দিয়ে তা সরিয়ে দিলে তবে তিনি শিব হয়ে পূজার যোগ্য হন। বাংলাদেশে পার্থিব শিবের পূজকেরা সবাই এই তত্ত্ব জানেন। ভারতের অন্যান্য স্থানের শৈবমতের সঙ্গে বাংলাদেশের শৈব-মতেরও বেশ একটু পার্থক্য আছে। কাশ্মীরের শৈবমত ও বাংলার শৈবমত এক নয়। রাবণ নাকি কৈলাসের মহাদেবকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে চাইলেন। শিব তো রাজি হন না। শেষে রাবণ একরকম জোর করে তাঁকে মাথায় করে নিয়ে চললেন। শিব একটা অজুহাত বার করে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত এসে সেখানেই থেমে গেলেন। কোনো কোনো মতে তিনি কর্মনাশা নদীও পার হন নি। এই কথার মধ্যে গভীর একটি ঐতিহাসিক সত্য আছে। এক দেশের শিব অন্য দেশে যেতে চাইতেন না। উত্তরের শৈবধর্ম ও শিবদেবতা বিহারের পাশে বা বড় জোর ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত এসে থেমে গেলেন। এইসব সূত্র ধরে কাজ করলে অনেক গভীর সত্যের সন্ধান মিলবে। পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলার শিবাচার্যেরা দক্ষিণ-ভারতেও ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কাজেই সেখানে বাংলার শৈব-ধর্মের প্রভাব মিলবে। এইসব কথায় বোঝা যায় দেশভেদে শিবের স্বরূপ শৈবমত ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এক দেশেরটা অন্য দেশে চলত না।

তন্ত্রশাস্ত্র ও শাক্তদর্শনের উৎপত্তি খুব সম্ভবতঃ এই বাংলাদেশেই। অন্ততঃ উইন্টারনিট্‌জ্ সাহেব তো তাই বলেন। কালীবিলাসতন্ত্রে পূর্ব-বাংলা ও আসামী ভাষায় খিচুড়ি দেখা যায়। বাংলার তন্ত্রশাস্ত্রের অতি প্রাচীন গ্রন্থকার মহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য, তাঁর গ্রন্থ কাম্য-মন্ত্রোদ্ধার। ১৩৭৫ খ্রীস্টাব্দে লেখা এই গ্রন্থের পুঁথি পাওয়া গেছে। তারপর হলেন মহাপ্রভুর সমসাময়িক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁর গ্রন্থ তন্ত্রসার। তারপরই ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর শেষে পূর্ণানন্দ। তিনি আসাম

ও মণিপুরে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার করেন। কামাখ্যাতেও শাক্তধর্ম প্রচার করেন বাঙালী কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ। আহোমরাজ রুদ্রসিংহ তাঁরই শিষ্য। এদিকে কুব্জিকামততন্ত্র সপ্তম শতকেরও পূর্ববর্তী। পরমেশ্বরমততন্ত্রের পুঁথিই পাওয়া গেছে ৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে লেখা। কাজেই এই মত আরও পুরাতন। মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয়ও এর চেয়ে কম পুরোনো নয়। বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর লোক। ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর কবি। তাঁদের লেখার মধ্যে কাপালিক ও তান্ত্রিক মতের পরিচয় মেলে।[১]

বাংলায় তান্ত্রিকদের ধারার সঙ্গে তৎপূর্ববর্তী নাথদের ধারার যোগ আছে। কৌলাবলীনির্ণয় গ্রন্থের দ্বিতীয় উল্লাসে তান্ত্রিক গুরুপরম্পরায় বহু নামের শেষেই 'নাথ' পদবী দেখা যায় (৯২-৯৩ শ্লোক)। এঁদের কায়াসাধনের সঙ্গে নাথদের কায়াসাধনার মিল আছে। তারাতন্ত্রের পূর্ব-পীঠিকায় দেখতে পাই বশিষ্ঠ বৈদিক সাধনায় সিদ্ধি না পেয়ে যোগপথে যান, তারপর চীনাচার মতে তান্ত্রিক সাধনায় ত্বরিত সিদ্ধিলাভ করেন।

ত্রিপুরায় মেহারের শক্তিপীঠের আদি সাধক সর্বানন্দ ১৪২৫ খ্রীস্টাব্দে সিদ্ধিলাভ করেন। এঁর পিতামহ বাসুদেবের পূর্বস্থান রাঢ়দেশে। কাশ্মীরের রঘুনাথমঠের নবাহ্নপূজাপদ্ধতি ও মধ্যভারতের ত্রিপুরার্চন-দীপিকা নাকি এঁরই রচনা। কাশীতে গণেশমহলায় এঁর মঠ আছে; হিমালয়েও এঁর মত কোথাও কোথাও চলে।

যশোরেশ্বরীর সঙ্গে কিছু তান্ত্রিক আবার রাজপুতনায় গেলেও ভাল পণ্ডিতের অভাবে সেই সঙ্গে রাজস্থানে বঙ্গীয় কোনো শাক্তদর্শনের তেমন প্রচার ঘটে নি। বেলুচিস্থানে হিংলাজে বাঙালী ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর শিষ্য জ্ঞানানন্দ তান্ত্রিক দর্শন ও সাধনা প্রচার করেন।

(১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নেপাল-পুঁথির তালিকা I, ১৯০৫, LXXVII, LXXVIII, II, ১৯১৫, XXI, XVIII,

শাক্ত ধর্মে ও দর্শনে প্রদেশভেদে নানা বৈচিত্র্য আছে। তবে শাক্ত দর্শনে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। তন্ত্রশাস্ত্র যদিও এখন ভারতের সর্বদেশেরই গূঢ় বিদ্যা, তবু সর্বদেশে তার রূপটি এক নয়। আগমবাগীশের লেখায় বাংলার শাক্ত সাধনা যা প্রকাশ পেয়েছে ঠিক তার মতো জিনিস দক্ষিণ-ভারতের শ্রীবিদ্যার সাধনায় দেখা যায় না। কাশ্মীরের তন্ত্রবিদ্যা ও কৌলসাধনাও ভিন্ন জিনিস। নেপালের সাধনার মধ্যে কতকটা বাংলা প্রভাব আছে। কিন্তু তার যতটুকু নেপালের নিজস্ব তাতে আর তন্ত্রসারের সাধনাতে অনেক প্রভেদ আছে। কাশীতে তৈলঙ্গস্বামী ছিলেন অন্ধ্রদেশীয় তন্ত্রসাধনার অনুবর্তী। তাঁর সাধনার স্থানে এখনও পাথরের তৈরি সব তাঁর সাধনার যন্ত্র ও চক্রগুলি আছে। সেগুলি দেখলে যাঁরা জানেন তাঁরা বেশ বুঝতে পারবেন। লক্ষ্মণদেশিক প্রভৃতি গুরুর মত আমাদের দিকে ঠিক মিলবে না। প্রভাস, মালাবার, কোচিন প্রভৃতি নানা দেশে তন্ত্রের নানা রূপ দেখা যায়। এইসব অন্তরঙ্গ কথা পাঠক-সাধারণের আলোচ্য হতে পারে না। তবে তান্ত্রিকদের মধ্যে সর্বত্রই কায়ার মধ্যে চক্রভেদ প্রভৃতি আছে। বাংলার যতি পূর্ণানন্দের শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও ষট্‌প্রকরণে যে ষট্‌চক্রনিরূপণ ও তার কালীচরণ, শংকর, বলদেব ও বিশ্বনাকৃত টীকাতে বাংলারই বিশেষত্ব রয়েছে। তন্ত্রের বহু বহু গ্রন্থ আছে, তাতে বাংলারও গ্রন্থসংখ্যা কম নয়। সে-সব কথাও অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছাড়া হতে পারে না।

বাংলার শাক্ত গান

বৈষ্ণবদের যেমন নিজস্ব গান আছে শাক্তদেরও তেমনি নিজস্ব সব গান আছে। এখন রামপ্রসাদ, দেওয়ান রামলোচন ও কমলাকান্তের আগেকার শাক্ত গান বড় একটা মেলে না। পূর্বে সেরকম গান অনেক

ছিল। তাকে মালসী বলত। তাতে শুধু তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সাধনা ও জ্ঞানের শাস্ত্রীয় কথাই নয়, বাংলার অন্তরের সুখ-দুঃখ-বেদনার পরিচয়ও মেলে এই সব মালসী আগমনী ও বিজয়া প্রভৃতি গানে।

তন্ত্র ও শাক্ত মতবাদ এক কথা আর বাঙালীর জীবনে কিভাবে তা দিনের পর দিন কাজ করছে তা আর-এক কথা। বাঙালী-শাক্ত তার উপাস্য দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্বন্ধে যুক্ত। সে-প্রেম একেবারে মানবীয়। আগমনী ও বিজয়াগানে ঘরে ঘরে গৌরীর জন্য কন্যাবিরহ-বিধুর পিতামাতার দল কেঁদে আকুল। দেবীকে মা বলে ডেকে দেওয়ান রামদুলাল, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত কত বেদনাই না জানিয়ে গেছেন। এই সব মানবীয় ভাব নিয়ে শাক্তদের বহু মালসী গান এদেশে প্রচলিত ছিল। এখনও পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও তার কিছু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু উৎসাহের অভাবে সেগুলি প্রায় সবই এখন বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেছে। সেই মালসীতে দেবীকে মানবীয় সম্বন্ধ দিয়েই ঘনিষ্ঠ করে দেখা হয়েছে। বাউলদের মধ্যে ভগবানকে যেমন নানা মানবীয় ভাবে দেখা হয়েছে মালসীতেও তাই। এই ভাব নইলে বাঙালীর প্রাণ তাতে সাড়া দিত না। প্রেমমাত্র-সম্বল বাংলাদেশকে ধন্য করতে গিয়ে দেবী এখানে শুধু মা হয়ে তৃপ্ত হন নি, তিনি প্রণয়িনী হয়েও বাংলাদেশকে ধন্য করে গেছেন। সাধক দ্বিজদেব তাঁকে পেলেন কন্যারূপে, রাঘবানন্দ পেলেন পত্নীরূপে।

পূর্ববাংলার দুইটি তান্ত্রিক গুরুপরম্পরাই এখন প্রধান। একটির নাম সর্ববিদ্যাবংশ। তার প্রবর্তক মেহারের সাধক সর্বানন্দ। অন্য ধারা হল মিতড়ার ঠাকুরদের পূর্বপুরুষ রাঘবানন্দের প্রবর্তিত। এই ধারাকে বলে অর্ধকালীর ধারা।

ময়মনসিংহ জেলায় আলাপসিংহ পরগনায় পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে

দ্বিজদেবের ঘরে দেবী কন্যারূপে অবতীর্ণ হয়ে রাঘবানন্দের পত্নীরূপে নারীলীলা দেখিয়ে যান। নিমন্ত্রণে অন্ন-পরিবেশনকালে তাঁর মাথার ঘোমটা বাতাসে উড়ে গেল। দুই হাতে খাদ্যের থালা। তাঁর লজ্জা রক্ষা হয় কিসে? হঠাৎ আর দুখানি হাত দিয়ে তিনি ঘোমটা সামলে নিলেন। কারো কারো চোখে তা এড়াল না। সকলে টের পেলেন রাঘবানন্দ-গৃহিণী মানবীরূপে দেবী। তাই এই বংশের সন্তান মিতড়ার গুরুঠাকুরদের বংশকে অর্ধকালীবংশ বলে। এঁদের বহু শিষ্য বাংলাদেশে।

মালসী গান

ছেলেবেলা আমরা অনেক মালসী গান শুনতে পেতাম। এখন সেগুলি ক্রমে লুপ্ত হয়ে এসেছে। কারণ তার জানি নে। হয়তো একদিকে অনাদর ও উপেক্ষা আর-একদিকে এইসব অনাদর হতে বাঁচাবার জন্যে গানগুলি গোপন করে রাখবার চেষ্টা প্রভৃতি অনেক কিছু হেতুই আছে।

এইসব মালসী গানে দেখা যায় ভক্ত ও দেবীর মধ্যে শুধু উপাস্য-উপাসক যোগ নয়— মাতাপুত্রের মতো একটি ঘনিষ্ঠ প্রেমের যোগও আছে। শিব-শক্তি যোগের মতোই তা এমন প্রগাঢ়, এমন মধুর যে, এককে বাদ দিয়ে অন্যকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কি সংসারের কাজে কি সংসার হতে মুক্তির সাধনায় উভয় ক্ষেত্রেই সাধক ও সাধ্যা দেবী উভয়ের যোগে সাধনা পূর্ণ হয়ে চলেছে। গঙ্গা-যমুনা সংগমের মতো এই যোগটি যেমন মধুর তেমনি সুন্দর ও পবিত্র। যে মুক্তিস্বরূপিণী জননী মুক্তি দেবার জন্য বন্ধনমোচন করবেন সেই আদ্যাশক্তি জননীই আবার আপন সন্তানকে নিয়ে এই সংসারে বসে

তার জন্য রমণীয় আশ্রয়নীড়টুকু রচনায় রত। রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তদের জীবনের সঙ্গে এইসব মালসীর কোনো কোনো কথা জড়িয়ে গেছে। এইসব গানে উপাস্য-উপাসকের ব্যবধান যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রেমের সাধনায় উপাস্য-উপাসকের এরূপ ভেদ ক্রমে ঘুচে আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু শাক্তদের সাধনা হল শক্তি নিয়ে। সেখানে তো এই ভেদ ঘুচবার কথা নয়। কিন্তু প্রেমপথের পথিক বাংলার প্রাণের মধ্যে এমন একটা মানবীয় রস আছে যে, এই দেবী আদ্যাশক্তিকেও মাতারূপে কন্যারূপে এমন কি অর্ধকালী-লীলায় দেবীকে প্রণয়িনীরূপেও দেখে সে ধন্য হয়েছে। এখানে বাংলার শাক্ত ও বাউলে কোনো ভেদ নেই।

শাক্ত ভক্তরাও তাই দেবীকে নিয়ে দুইয়ে মিলে মুক্তির সাধনা এমন কি সংসারের কাজও চালিয়ে গেছেন। ভক্ত রামপ্রসাদ একদিন ঘরের বেড়া বাঁধতে গেলেন। বেড়ার ওদিক হতে কেউ তো বাঁধবার বেতটি ফিরিয়ে না দিলে চলে না। তাই তিনি কন্যাকে ডাকলেন সাহায্য করতে। হয়তো কন্যা সে ডাক শুনতে পান নি আর নয়তো তিনি ছিলেন অন্য কাজে ব্যস্ত। রামপ্রসাদ ব্যাকুল হয়ে ডাকলেন, "কই মা, কত আর তোর জন্য বসে থাকব? তুই কি আর আসবি নে?"

মহানির্বাণের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ যামলগ্রন্থ-লিখিত আদ্যার মহাশক্তিবাদ বা কোথায় আর বাংলাদেশের প্রাকৃত জনের ঘরে ঘরে দেবী যে আপন জন হয়ে আছেন সেই মতবাদই বা কোথায়? এই ঘরোয়া দেবীকে নিয়েই বাংলাদেশের চিত্ত ভরে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রাকৃত শাক্ত মতবাদে নির্বিকল্প ব্রহ্মবাদ বা শক্তিবাদ মানবীয় প্রেমেই পর্যবসিত হয়েছে। তাই পরাৎপরা ব্রহ্মময়ী বিশ্বভুবনেশ্বরী ভক্তের ব্যাকুল ডাকে

মানবীর রূপে এসে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়ায় বেতের বাঁধন বাইরে বসে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এক দিকে কন্যারূপিণী জগন্মাতা, অন্যদিকে রামপ্রসাদ— দুয়ে মিলে বেড়ার বাঁধন চলল। রামপ্রসাদ বাইরের দেবীকে দেখতে না পেলেও তাঁর অন্তরের মধ্যে কি এক দিব্য অনুভূতি ভরে উঠল। ঘরবাড়ি সব দিব্য ভাবে ও পরিপূর্ণতায় ভরে উঠল।

বাঁধন শেষ হতেই মর্ম বুঝবার জন্য রামপ্রসাদ কন্যাকে দেখতে দৌড়ে গেলেন বাইরে। দেখলেন মুক্তকেশী এক মেয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন পালিয়ে। মুখখানি দেখা গেল না, শুধু তাঁর কৃষ্ণ কেশপাশ আর রাঙা অলক্তাক্ত চরণদুখানি মাত্র দেখতে পেলেন রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের প্রাণ মন অন্তরাত্মা আরও যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে রামপ্রসাদ কন্যাকে খুঁজতে লাগলেন। দেখলেন, কন্যা বসে ঘরের কাজে রত। কই কন্যা তো বেড়া বাঁধতে যান নি! কন্যার চরণে আলতাও নেই, মাথার কেশও এলো নয়। তখন রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন এই সবই আদ্যাশক্তি জগৎ-জননীর চাতুরী। তখন কেঁদে তিনি বললেন, "সারা জনম ডেকে ডেকে মরলাম, তখন তো দেখা দিলি নে, আর কোন এক অসাবধান মুহূর্তে অলক্ষ্যে এসে আমার সঙ্গে কাজে যোগ দিয়ে দেখা না দিয়েই চলে গেলি! আমি কি কাজ চাই না সিদ্ধি চাই? আমি যে মা তোকেই খুঁজি। হায় মুক্তকেশী, যদি তোকে আসতেই হল তবে আমার বেড়া খোলবার কাজে না এসে বেড়া বাঁধবার কাজেই তুই এলি! তুই দিবি মা মুক্তি, তুই কেন মা সংসার-ঘরের বেড়া বাঁধবি!"

হয়তো তাঁর এই অনুভূতিরই আভাস পাই তাঁর "মন রে কৃষিকাজ জান না" নামে বিখ্যাত গানে। তাতে তিনি বলেছেন—

মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।[১]

দেবতা-মানুষ উভয়ে মিলে যে একসঙ্গে সমানভাবে সাধনা করতে হবে, তা বুঝতে পারি রামপ্রসাদের এই গানে—

একা যদি না পারিস তো
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।

মনের দুঃখে রামপ্রসাদ এই কথা বললেও তিনি জানতেন যে, এই জগন্মাতাই মুক্তিস্বরূপিণী হয়ে সব মুক্ত করে নিয়ে যান আর তিনিই স্নেহময়ী হয়ে সংসারের বেড়া বেঁধে তাঁরই প্রেমের জগতে আমাদের আশ্রয় দেন।

শাক্ত সাধনার মধ্যে এইরূপ স্নেহের সম্বন্ধ বাংলার বাইরে কি আর কোথাও আছে? দক্ষিণ ভারতেও শক্তি-সাধনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেখানে দেখতে পাই, শ্রীবিল্লা আর ক্রাঙ্গানোর (Cranganore) প্রভৃতি তীর্থে মীনভরণীর উৎসব। বাংলার আগমনী, বাংলার বিজয়া, বাংলার এই মধুর প্রেমযোগ আর তো কোথাও দেখি না।

মুর্শিদাবাদ কিরীটেশ্বরী ও পূর্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে দেবীর নামে চমৎকার সব গানের পালা আছে। দেবী থাকেন মন্দিরে। পূজকঠাকুর প্রতিদিন পূজা করেন। দেবী যেন সুন্দরী মেয়েটি। নিভৃতে সবার দৃষ্টির আড়ালে দীঘির ঘাটে অলক্তাক্ত চরণ দুখানি ডুবিয়ে বসে থাকেন। দেবী একদিন দেখেন শাঁখারী শাঁখা নিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, 'শাঁখা পরবি মা?' দেবীর ইচ্ছা হল শাঁখা পরতে। ডাকলেন শাঁখারীকে, শাঁখা পরতে চাইলেন।

কী রূপ, কি দুখানি রাঙা চরণ! শাঁখারীর দুচোখ জলে ভরে এল!

(১) যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাধনসঙ্গীত, ১৩৩৫, পৃ. ১১৬।

ঐ হাতে শাঁখা পরিয়ে দিয়ে সে কৃতার্থ হল। তবু মনের দুঃখে বললে, "মা, তোর হাতে পরালাম শাঁখা, ধন্য হলাম। কিন্তু বড় গরিব আমি, শাঁখা বেচে খাই, এর মূল্য না পেলে ছেলেপিলে যে না খেয়ে মরবে।" দেবী বললেন, "ঐ মন্দিরের পূজারী আমার বাপ, তাঁকে বোলো তাঁর মেয়ের শাঁখার দাম তিনি যেন দেন। যদি তিনি বলেন 'টাকা কই ?' তবে বোলো তাঁর দেবীর ঝাঁপিতে যে দুটি টাকা আছে তাই যেন তিনি তোমায় দেন।" শাঁখারী গিয়ে মেয়ের শাঁখার দাম চাইলে পূজারী বিস্মিত হয়ে বললেন, "মেয়ে তো আমার নেই, বাবা।" তবু একবার ঝাঁপি খুলে দেখেন, ঠিক দুটি টাকাই আছে। এ টাকা তো পূর্বে ছিল না! শাঁখারী বললে, "বিশ্বেস না হয়, ঠাকুর, ওই ঘাটে গিয়ে দেখ, তোমার মেয়ে বসেই আছেন।" গিয়ে দেখেন কন্যা নেই। শাঁখারী ডেকে বললে, "মাগো, তোমার হাতের শাঁখা তোমার বাবাকে দেখাও না মা একবার, তিনি যে পেত্যয় করেন না।" শুনে সরোবর থেকে শাঁখাসুদ্ধ হাতদুখানি দেবী একবার তুলে দেখালেন।

তখন পূজারী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বললেন, "মাগো, এতকাল পূজা করে তোর দেখা পেলাম না, আর কী পুণ্যফলে এই দীনহীন শাঁখারী তোকে দেখতে পেল, তোর চরণদুখানি দেখতে পেল, তোর হাতে শাঁখা পরাল! তারই কৃপায় কিনা আজ আমি তোর শাঁখাপরা হাত দুখানি মাত্র একটিবার দেখতে পেলাম!"

বাংলাদেশের বৈষ্ণবধর্ম

বাংলার শৈব ও শাক্ত ধর্মের মতো বাংলার বৈষ্ণব ধর্মেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য জায়গার বৈষ্ণবধর্ম মিলবে না। ভারতীয় বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান হল

শ্রীমাধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক। এর কোনোটাই বাংলার বৈষ্ণবধর্ম নয়। অথচ বাংলার বৈষ্ণবধর্ম অতি পুরাতন। পাহাড়পুরে যে বৈষ্ণবধর্মের পরিচয় পাই তা অন্তত দেড় হাজার বছরের পুরানো অর্থাৎ এই সব মতের থেকে প্রাচীনতর; বঙ্গদেশ-প্রচলিত কৃষ্ণলীলাই তাতে চিত্রিত।

Anthology অর্থাৎ নানা কবির কাব্যসংগ্রহ অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সংস্কৃত প্রাচীনতম কাব্যসংগ্রহ কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয় বাংলাদেশে লেখা। তারপর শ্রীধর দাসের সদুক্তি-কর্ণামৃতও বাংলাদেশেরই রচনা। তাতে অনেক বাঙালী বৈষ্ণব কবির রচনা রয়েছে। মাধ্বমত-প্রবর্তক আনন্দতীর্থের তখন সাত আট বৎসর মাত্র বয়স।[১] মহাপ্রভুর মত শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাদি কোনো সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত করা যায় না।

তবে মহাপ্রভুকে কেউ কেউ যে মাধ্বমতের অনুবর্তী বলে ধরেন, তা কি ঠিক? জয়দেব-চণ্ডিদাসের গীত তো মাধ্বমতের বিরোধী। মহাপ্রভুর আবার এঁরাই উপজীব্য। রাসপঞ্চাধ্যায় মাধ্বমতে অচল হলেও মহাপ্রভুর তা প্রাণস্বরূপ। মাধ্বমতে সাধনায় ব্রাহ্মণেরই অধিকার। মহাপ্রভুর মতে সাধনায় সবারই অধিকার। শ্রীমন্ নিত্যানন্দকেই তিনি আজ্ঞা দিলেন—

আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান।[২]

মাধ্বমতে ভক্তির সঙ্গে আচরণ যুক্ত থাকা চাই। মহাপ্রভুর মতে শুদ্ধা ভক্তিই যথেষ্ট। মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ ও নিত্য-বৃন্দাবনলীলা তাঁর আপন জিনিস। তবে লীলাশুকের কৃষ্ণকর্ণামৃত তিনি খুবই আদর করেছেন। বিষ্ণুস্বামী মতের ভালো ভালো জিনিসও তিনি নিয়েছেন,

---

(১) জন্ম ১২৯৭, ভাণ্ডারকর। (২) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৫শ।

মাধ্ব নিম্বার্ক হতেও নিয়েছেন। রামানুজের বহু সিদ্ধান্ত জীবগোস্বামীও গ্রহণ করেছেন। তবু মহাপ্রভুর মত তাঁরই নিজস্ব। বাংলাদেশের প্রাচীন বৈষ্ণবভাবের উপরই তার প্রতিষ্ঠা। ভক্তিরত্নাকরে মহাপ্রভুকে মাধ্ব বলা হয়েছে। কিন্তু তার রচয়িতা নরহরি অনেক পরের মানুষ। চারি সম্প্রদায়ের পঙ্‌ক্তিতে উঠবার জন্য বলদেব বিদ্যাভূষণও মহাপ্রভুর মতকে মাধ্ব বলেছেন। কিন্তু তা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। আর তাঁর লেখা পীঢ়িতে (গুরুশিষ্যপরম্পরা) ও মাধ্বদের পীঢ়িতে মিলও নেই। কাজেই তাঁর প্রমাণ অচল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখিয়েছেন মহাপ্রভু যখন মাধ্বতীর্থ উডুপীতে গেলেন তখন সেখানকার মাধ্বেরা প্রহাপ্রভুকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেন নি, তিনিও মাধ্বদের মতকে পরমত বলেই মনে করেছেন এবং মাধ্বদের গর্ব চূর্ণ করে ('তারঘরে গর্ব চূর্ণ করি'[১]) তিনি ফল্গুতীর্থে চলে এলেন। মহাপ্রভুর গুরুদের 'পুরী' 'ভারতী' প্রভৃতি উপাধিতে মনে হয় তাঁরা দশনামী সম্প্রদায়েরই ছিলেন। মোটকথা বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকাল হতেই কৃষ্ণভক্তি চলে আসছিল। যদিও সেই কৃষ্ণ-ভক্তিকে রামানন্দ-মাধ্ব-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বার্ক উত্তরভারত-প্রচলিত এই চারি সম্প্রদায়ের কোনোটার মধ্যেই ফেলা যায় না। বাংলাদেশের বৈষ্ণব মত বাংলাদেশেরই প্রাকৃত বস্তু। বহুকাল ধরেই সেই ধারা এইখানে চলে আসছিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মধ্যে বাংলার সেই নিজস্ব ধারার খানিকটা পরিচয় মেলে। মহাপ্রভুর মধ্যে বাংলার সেই ধারাটির স্বরূপ রীতিমত দেখতে পাই। কাজেই বাংলাদেশের বাউলেরা যে মহাপ্রভুকে নিজেদের পূর্বগুরুর মধ্যে মানেন তা যুক্তিহীন নয়।

(১) মধ্যলীলা, ৯ম।

বাংলাদেশের রাম বাল্মীকির রাম নন্। কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিরা বাংলায় মানবীয় রামচরিত এঁকেছেন। বাংলার নরহরি কৃষ্ণ মহাভারত হরিবংশ বা ভাগবতের দেবতা কৃষ্ণ নন। পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কতকটা প্রাকৃত ভাব আছে। জয়দেব কোথাও কোথাও তাঁদের কাছে ঋণী। তবু জয়দেবে বাংলাদেশের কৃষ্ণচরিতই পাই। জয়দেব সংস্কৃত গানের সম্রাট। গানের খাতিরে তাঁর গীতগোবিন্দ সারা ভারতে ছড়িয়েছে। মানবরূপে-ভরপূর কৃষ্ণচরিতই হল আমাদের দেশের আসল কৃষ্ণচরিত। তা মিলবে চণ্ডিদাস প্রভৃতির রচনায়। তাঁদের লেখা বাংলাতে। তবে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্যদের সংস্কৃত লেখার জোরে বাংলার বাইরেও বাংলার বৈষ্ণব মত কিছু কিছু ছড়িয়েছে।

বাংলার কৃষ্ণভক্তির সেই নিজস্ব রূপটি মহাপ্রভুর মধ্যে কতটা দেখা যায় তা দেখতে চেষ্টা করা যাক— কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হতে। মহাপ্রভুর মতের এর চেয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ তো আর নেই। বাউলদের কাছে শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য, প্রেমই মান্য, মানুষই সারতত্ত্ব। আপনার মধ্যেই বিশ্বকে উপলব্ধি করে প্রেমের পথেই বাউলদের সাধনা।

মহাপ্রভুর হিসাবেও ভগবানের সর্বোত্তম স্বরূপ হল তাঁর মানব-স্বরূপ, কারণ, মানবরূপেই প্রেমের লীলা চলে। কৃষ্ণদাসও বলেন, ভগবানের সর্বোত্তম লীলা তাঁর নরলীলা।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা।১

কাজেই মহাপ্রভুর কাছে ভগবান বিশেষ একটি সর্বাতীত তত্ত্বমাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রেমময় প্রেমের ধন পরম পুরুষ। এখনকার

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২১শ।

দিনের মানবিয়ানা (Anthropomorphism) প্রভৃতির জুজু দেখে ডরাবার মানুষ মহাপ্রভু ছিলেন না। মানবভাবের মধ্য দিয়ে না দেখলে মানুষের পক্ষে উপলব্ধিই যে অসম্ভব। কাজেই মানুষীয় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি ভাবের দ্বারাই ভগবানকে পেতে হবে।[১] সহজ স্বাভাবিক জীবনই তাঁর প্রিয় ছিল। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি মাকে যে ছেড়ে এসেছেন সে দুঃখ তাঁর কখনো যায় নি।

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ॥২

মহাপ্রভুর মণ্ডলীতে সবাই সহজ জীবন ভালবাসতেন বলে তাঁদের মধ্যে শিখাসূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েও যোগপট্ট না নিলে দোষ হত না। স্বরূপদামোদর এই রকম ছিলেন।—

যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ।৩

সন্ন্যাস ও অসন্ন্যাসের মধ্যে সাধারণতঃ যে দারুণ ভেদ ছিল তাহা মহাপ্রভুর কৃপায় অনেকটা সহজ হয়ে এল।

এই ভেদ ও দ্বৈত মেটানোর কাজে মহাপ্রভুর শিক্ষা অনেক কাজ করেছে। প্রেমের ধর্মেও সব দ্বৈত মেলে। তাই তো বাউলদের কথা—

নিত্য-দ্বৈতে নিত্য-ঐক্য প্রেম তার নাম।

বিষ্ণু ও লক্ষ্মী আপন আপন ঐশ্বর্যে ভিন্ন। ব্রজের রাধাকৃষ্ণে ঐশ্বর্য-ভাব দূর হয়ে গেল বটে তবু ব্রজে রাধাকৃষ্ণ যুগল হয়েও দুই হয়েই রইলেন। নবদ্বীপে রাধাভাব নিয়ে কৃষ্ণলীলায় রসবন্যা বইল। দুই সেখানে মিলে এক হয়ে গেল। একের মধ্যে আর ডুবে গেল। শ্রীগৌরাঙ্গে রাধাকৃষ্ণ দুইই মিলে আছেন।

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯শ। (২) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১৯শ; ঐ, মধ্য, ১৫শ। (৩) ঐ, ঐ, ১০ম।

মানবে ও দেবতায় যে ভেদ তাও প্রেমে ক্ষীণ হয়ে এল। সে কথা পরে হবে।

মানবীয় প্রেম-দাস্য-সখ্যাদির উপরই দৈবী ভক্তি ও দিব্য প্রেমের প্রতিষ্ঠা।

কি করে কামকে প্রেম করা যায় তাও তাঁরা দেখিয়ে দিলেন। যতক্ষণ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ততক্ষণ তা কাম। যখন প্রেমময়কে তৃপ্ত করার ইচ্ছা তখনি তা প্রেম।[১]

বাংলাদেশের এই এক অপূর্ব অদ্বৈতভাবে সব দ্বৈত ও বিরোধের সমস্যা মিটেছে। এই সমন্বয়ের মূলে প্রেমের সর্বভেদবিনাশন দিব্য আলোক। বাংলাদেশ এই আলোকেরই উপাসক।

মহাপ্রভু তো কোনো গ্রন্থ রচনা করে রেখে যান নি। তাঁর মতামত দেখা যায় তাঁর আপন জীবনে। আর মহাপ্রভুর মতামত ভালো করে বুঝতে পারি তাঁর দেওয়া শিক্ষায়। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন[২] এবং শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি যা উপদেশ দিয়েছেন[৩] চিরদিন ভক্তগণ তার সমাদর করবেন। রঘুনাথ দাসকে যে উপদেশ মহাপ্রভু দিলেন, তার মতন সহজ কথায় সহজ জীবনের নির্দেশ কোথাও তো একটা দেখা যায় না।

স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাউল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥[৪]

তবে জীবনকে সব সময়েই বড় আদর্শের দ্বারা জীবন্ত ও চালিত

(১) চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ। (২) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২০শ। (৩) ঐ, ঐ ১৯শ। (৪) ঐ, ঐ ১৬শ।

করতে হবে। ক্ষুদ্র ভাব ও কথার মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দিলে চলবে না। তাই পরে এই রঘুনাথকে একথাও মহাপ্রভু বলেছেন—

গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।১

কুলীনগ্রামী মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৈষ্ণব কা'কে বলে?' তিনি উত্তর করলেন,

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥২

যবন হরিদাস তো মহাভক্তই ছিলেন। বাইরের যবনকেও মহাপ্রভু কৃষ্ণ-হরি নাম দিয়েছেন।৩

একটিমাত্র গুরুকে আশ্রয় করে চলতে হবে তার কোনো মানে নেই। গুরু বলে কৃষ্ণদাস ছয়জনকে প্রণাম জানালেন।৪
আর,

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়।৫

সে ব্যক্তি

কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী
শূদ্র কেন নয়॥৬

গুরু উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে ভগবানই হলেন গুরু।

গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে।৭

অন্তরে প্রেমরূপে এবং বাহিরে বিশ্বসৌন্দর্যরূপে নিয়তই চলেছে তাঁর শিক্ষা। কাজেই গুরু হলেন প্রেম এবং সেই প্রেম বিশ্বচরাচরের সর্ব সৌন্দর্যের মধ্যেই দেখতে পাই। শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্যশিক্ষা দেন কে? 'নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ?' উত্তর এল,

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৬ষ্ঠ। (২) ঐ, মধ্য, ১৬শ। (৩) ঐ। (৪) ঐ, আদি, ১ম। (৫) ঐ, মধ্য, ১৫শ। (৬) ঐ, ঐ, ৮ম। (৭) ঐ, ঐ, ২২শ।

'দিগ্‌বিদিকে প্রতি তরুলতায় স্ফুরিত তোমার মূর্তিই আপন নৃত্যছন্দে তাঁকে নৃত্যশিক্ষা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

তং ত্বন্মূর্তিঃ প্রতিতরুলতং
দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী।
শৈলূষীব ভ্রমতী পরিতো
নর্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥১

এসব কথা তো শাস্ত্রের বা সম্প্রদায়ের নয়। আসলে তাঁর মধ্য দিয়ে বাংলার চিরন্তন সব মানবীয় ভাবই মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই বাউলরা তাঁকে মহাগুরু বলেন। তিনি নিজেও রামানন্দকে বললেন,

আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।২

বাউলরা জাতিপঙ্‌ক্তি মানেন না। মহাপ্রভু সামাজিকভাবে তা ত্যাগ না করলেও জাতিপঙ্‌ক্তি বেশি মানতেন না। অদ্বৈতগৃহে খেতে বসে তিনি মুকুন্দ ও হরিদাসকেও সঙ্গে খেতে ডাকলেন। মুকুন্দ এলেন না, তাঁর তখনও জপ শেষ হয় নি বলে রেহাই নিলেন। হরিদাসও নিজেই এলেন না।৩ হরিদাসকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র খাওয়ালেন। হরিদাস নিজে তাতে সংকুচিত।

বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলু ম্লেচ্ছ হইয়া।৪

হরিদাসের মৃত্যুর পর ভক্তেরা তাঁর পাদোদক পান করলেন। সামাজিক-ভাবে মহাপ্রভু যদিও জাতিভেদ তুলে দেন নি, তবু পরে বৈষ্ণবসমাজে জাতিভেদ থাকবে কি যাবে সেই বিষয়ে খুব আলোচনা হয়। প্রভু নিত্যানন্দ জাতিভেদ ত্যাগের পক্ষেই ছিলেন। অদ্বৈতচার্যের আগ্রহে

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ। (২) ঐ, মধ্য, ৮ম। (৩) ঐ, ঐ, ৩য় (৪) ঐ, অন্ত্য, ১১শ।

জাতিভেদ রয়ে গেল। তবু মহাপ্রভু শূদ্রের হাতে ব্রাহ্মণদের দীক্ষার ব্যবস্থা করে জাতিভেদের বিষ মেরে রাখলেন।

সন্ন্যাসী পণ্ডিতদের করিতে গর্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ॥১

শূদ্র রামানন্দের কাছে উপদেশ শুনিয়ে ব্রাহ্মণ্য-গর্বিত প্রদ্যুম্ন মিশ্রের গর্ব চূর্ণ করলেন।[২]

আত্মপরিচয় দিতে গিয়েও মহাপ্রভু তাই বলেছেন, "আমি তো ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়ও নই, বৈশ্যও নই, শূদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, বর্ণাশ্রমী বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নই। যিনি নিখিল পরমানন্দপরিপূর্ণ অমৃতসাগর-স্বরূপ আমি সেই শ্রীকৃষ্ণেরই চরণকমলের দাসদাসানুদাস মাত্র।"

নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্ নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

মহাপ্রভুর এই আত্মপরিচয়টি উত্তরকালের জন্য রেখে গেলেন তাঁরই পরম ভক্ত শ্রীমন্ রূপগোস্বামী তাঁর পদ্যাবলী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে।[৩] পাছে লোকে সেই কথা ভুলে যায় তাই কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সেই সত্যকে আবার উদ্ঘোষিত করে গেলেন।[৪]

কৃত্রিম পরিচয়ের বন্ধন ছাড়িয়ে সহজ মানুষ হবার জন্যই মহাপ্রভুর আকাঙ্ক্ষা। তাই তাঁর কাছে নীচজাতীয় বা অস্পৃশ্য কেউ ছিল না। অদর্শনীয়দেরও তিনি প্রেমদৃষ্টিতে দেখেছেন—

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৫ম। (২) ঐ, অন্ত্য, ৫ম। (৩) পদ্যাবলী, ৭২তম অঙ্ক। (৪) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৩শ।

অদর্শনীয়ানপি নীচ জাতীন্
স বীক্ষতে চারু।১

প্রেম বলেন, তাতে দোষ কি? শাস্ত্রীয় পথ পৃথক, অনুরাগের পথ পৃথক। শাস্ত্রীয়েরা খোঁজেন নিয়ম আর প্রেমিকরা খোঁজেন অনিয়ম।

শাস্ত্রীয়ঃ খলু মার্গঃ পৃথগনুরাগস্ত মার্গোঽন্যঃ।
প্রথমোর্হতি সনিয়তাম্ অনিয়তাম্ অন্তিমো ভজতে।২

শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন, প্রেমপথের যে পথিক সে কারো গোলাম নয়, সে তো কারো ধার ধারে না।

ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।৩

প্রেমপথের পথিক মহাপ্রভু তাই উচ্চনীচ বিচার করেন নি, বৃথা বাঁধনকে মানেন নি, কারো গোলামি করেন নি। কারো ধার ধারেন নি। তবে আর বাউলদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ কি রইল?

এই হিসাবে মহাপ্রভু নিজেই নিজেকেও জাতপাতহীন বাউলদের দলে এনে ফেললেন। তাই অদ্বৈতাচার্যও মহাপ্রভুকে বাউল বলে সম্বোধন করেই খবর পাঠালেন—

বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
… … …
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।৪

কাজেই দেখা গেল অদ্বৈতাচার্য নিজেকেও বাউলের মধ্যে ধরে গেলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তো বাউলই ছিলেন। এখনও বাউলেরা তাঁকে আদিগুরু বলে ভক্তি করেন।

বাউল অর্থাৎ সহজ মানুষ বলেই মহাপ্রভু প্রেমকেই সব চেয়ে উচ্চ

(১) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৮ম অঙ্ক। (২) ঐ, তৃতীয় অঙ্ক। (৩) ভাগবত, ১১, ৫, ৪১; চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২২শ। (৪) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১৯শ।

স্থান দিয়েছেন আর সৌন্দর্যের উপাসকরূপে তিনি কৈশোরকেই ধ্যানের যোগ্য বলেছেন।

বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্।
আদ্য এব পরো রসঃ।[১]

আমাদের দেবদেবী সবই তরুণ-তরুণী। গ্রীকদের মত বুড়ো দেবতার পূজা এদেশে অচল। মহাপ্রভু শুধু যে সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন তা নয়; নৃত্যে, গীতে, নাটকে, সাহিত্যে, অভিনয়ে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাতে তিনি নানাভাবে যোগ দিয়েছেন। বাল্যকালে নিজে তিনি বহুবার অভিনয়ও করেছেন। পরেও নবদ্বীপে দানলীলাতে তিনি যে অভিনয় করেন তার খবর পাই কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে।[২] রূপ গোস্বামী ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র করে নাটক করেছিলেন। সত্যভামা তা পৃথক করে রচনা করতে আজ্ঞা দেন। পরে মহাপ্রভুও তাই বলেন।—

পৃথক নাটক করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল।[৩]

সেইজন্যই বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব দুই ভিন্ন নাটক রচিত হল।

পরমাসুন্দরী, বয়সে কিশোরী, দুই দেবকন্যা বা দেবনর্তকীকে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ নিভৃত উদ্যানে নিজ নাটক শিখিয়েছেন।

দুই দেবকন্যা হয় পরমাসুন্দরী।
নৃত্যগীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী॥
তাঁহা দোঁহে লৈয়া যায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতি শিখায় নর্তনে॥[৪]

অথচ এই মহাপ্রভুই প্রকৃতি-সম্ভাষণ-অপরাধে ছোট হরিদাসকে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন। তাতেই বোঝা যায় কলা ও

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯শ। (২) পরিশিষ্ট দর্শনীয়। (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১ম। (৪) ঐ, ঐ, ৫ম।

সৌন্দর্যের পথে সাধনা করতে গেলে কে যোগ্য পাত্র এবং কে যোগ্য নয় তা তিনি জানতেন এবং কতটুকু কার যোগ্যতা তাও মহাপ্রভু বুঝতেন। মুখে বটে বলি প্রেম, কিন্তু প্রেম যে কি বস্তু তা কয়জনে বোঝেন? যে প্রেম তাঁরা আশ্রয় করলেন, সেই প্রেম বলে কাকে? কৃষ্ণদাস জানালেন, ভগবানে গাঢ় রতির নামই প্রেম।

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে প্রেম অভিধান।১

কাম-প্রেমের ভেদ কৃষ্ণদাস দেখিয়েছেন—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥২

শক্তির ক্ষেত্রে উচ্চনীচ ভেদ থাকা চাই, প্রেমের ক্ষেত্রে নয়। দুই পক্ষ সমান নইলে আর প্রেম কি? অধীনের সঙ্গে প্রেম তো জুলুমমাত্র। তাই প্রেমে মানুষ ভগবানের সঙ্গে সমভাব প্রাপ্ত হয়। আপনাকে যেজন তাই ভগবানের চেয়ে হীন মনে করে সে প্রেমের মর্মই জানে না। কবিরাজ গোস্বামী বললেন,

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥৩

এসব খাঁটি বাউল মত। এই প্রেমের জগতে কেউ উচ্চ কেউ তুচ্ছ থাকবে তা তো হবে না। তাই ভগবানকেও মানুষের সঙ্গে সমান হয়ে প্রেমের খেলায় যোগ দিতে হবে। এই প্রেমের মধ্যে প্রভুত্ব ঐশ্বর্য প্রভৃতির ঠাঁই নেই। ঐশ্বর্য এলেই প্রেম দুর্বল ও শিথিল হয়ে যায়।

ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।৪

মানবীয় প্রেমেও এইসব কথা খাটে। বাংলাদেশের প্রেমসাধনাতে

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৩শ। (২) ঐ, আদি, ৪র্থ। (৩) ঐ, ঐ, ঐ। (৪) ঐ, ঐ, ঐ।

ভগবৎপ্রেমও মানবীয় প্রেমেরই একটি পরম রূপ। এই প্রেমের মধ্যে নানা বিরুদ্ধ ধর্মও সুসংগত। কারণ, প্রেম "বিরুদ্ধধর্ম্মময়"[১]।

লোকে ভাবে একত্র বাস করলেই বুঝি প্রেম হয়, তাই সামাজিক গুরুরা বিবাহাদির সময়ে আশীর্বাদ করেন, 'গঙ্গা-যমুনার মত সংগত হও'। কিন্তু দেহের কাছে দেহ রাখলেই কি প্রেম হয়? প্রেমবস্তু ভগবৎকৃপা ছাড়া দুর্লভ।

কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।২

এ সবই বাউলদের অনুরাগতত্ত্বের কথা। যে বৃন্দাবনে এই প্রেমলীলা, তা তো কোনো ভৌগোলিক স্থান নয়। সেই বৃন্দাবন আমাদেরই অন্তরে। তাই মহাপ্রভু গাইলেন, 'আমার অন্তরে তুমি এস।' কারণ,

অন্যের হৃদয় মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি।
... ...
ব্রজ আমার সদন তাঁহা তোমার সংগম
না পাইলে না রহে জীবন॥৩

বাউল ছাড়া একথা বলবে কে?

প্রেমের সাধনার মধ্যেও মহাপ্রভুর এমন একটি অপূর্বত্ব আছে যাতে করে প্রেমের রাজ্যে সম্পূর্ণ নতুনভাবে একটা যোগলীলা জগতে দেখা গেল। পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রত্যেকেই জানে আপনাকে। একে অন্যকে প্রেম করে। কিন্তু তার নিজের ভিতরে যে প্রেমের আনন্দ অন্যে পায়, তা কেমন করে সে জানবে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার প্রেমের কি মহিমা, কি আনন্দ, তা তো সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণেরও অগোচর। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গলাভে

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ। (২) ঐ, ঐ, ঐ। (৩) ঐ, মধ্য, ১৩শ।

শ্রীরাধিকার কেমন রসাস্বাদনসুখ তাই জানতে হল তাঁর লোভ। শ্রীরাধার সেই ভাবটি নিয়ে সাগরে চন্দ্রোদয়ের মত মানব-মাতার গর্ভ-সিন্ধুতে তাঁর হল উদয়। শ্রীরাধার ভাবরূপ নিয়ে সেই রসটি আস্বাদন করতেই মানবীয় রূপে মহাপ্রভুর অবতার। সেই অবতারের মূল রহস্যটি অপূর্ব ভাষায় দেখিয়ে গেলেন শ্রীস্বরূপ গোস্বামী—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তিলোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥১

রূপ দেখি আপনার   কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ॥২

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥
...   .
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার ॥৩

এই কথা বললেন কবিরাজ গোস্বামী। আবার এই তত্ত্বটিকেই বাউল-ভাবরসিক কৃষ্ণকান্ত পাঠক মানবীয় রসে রসিয়ে গান করলেন—

জানি কার রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে ও গৌর হয়েছে।
জানি কারে বাসত ভালো,
কে মনের মত ছিল,
সদা ওর মন ছিল সেই রূপের কাছে।
তার পেল না তল,

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ। (২) ঐ, মধ্য, ২১শ। (৩) ঐ, আদি, ৪র্থ।

তাই তো পাগল
ডুব দিয়ে নদেয় উঠেছে ॥

মহাপ্রভু এই যে প্রেমলীলা-অনুভবের একটি নূতন দিক দেখিয়ে দিলেন তাতে করে বাংলার বৈষ্ণবধর্মে প্রেমলীলার কত যে বৈচিত্র্য মানবচিত্তে ধরা পড়ল তা আর বলে শেষ করা যায় না। রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থখানা দেখে আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল বলেছিলেন, 'সারা জগতে যৌন-বিজ্ঞানে এত বিচিত্র রকমের ঐশ্বর্য কোথাও দেখা যায় না।'

জীবগোস্বামী যে ষট্‌সংদর্ভ রচনা করলেন, বলদেব যে ব্যাসসূত্রের গোবিন্দভাষ্য করলেন, তার মধ্যে মহাপ্রভুর এই প্রেমসম্পদের অপূর্ব ছায়াপাত ঘটেছে বলেই তা এমন জিনিস যা বাংলাদেশের বাইরে দুর্লভ। ধর্মে দর্শনে সাহিত্যে শিল্পে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বাংলার দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষত্ব আছে। বাংলার এই বিশেষত্বটি বাংলাদেশের সমস্ত রচনায় সকল সৌন্দর্যসৃষ্টিতেই দীপ্যমান। একেই বাংলার সৃষ্টিলীলার বা রচনার প্রাণশক্তি বলা যেতে পারে। ধর্মে দর্শনে সাহিত্যে শিল্পে সর্বত্রই তার এই বিশেষত্ব। সর্বত্রই তার অলঙ্কারের চেয়ে ব্যঞ্জনাই বড়। শুধু তার ব্যতিক্রম দেখা যায় বাংলার সংস্কৃত-রচনার গৌড়ীয় রীতিটিতে। সেখানে বাংলা তো নিজভাবে আত্মসাধনার পরিচয় দিচ্ছে না, সেখানে সে সংস্কৃতের সেবাদাসীমাত্র। যেখানে বাংলা সহজ ও প্রাকৃত সেখানেই তার বাহ্য অলঙ্কারের স্থলে তার আন্তর ব্যঞ্জনার অতলস্পর্শ অপরিমেয়তা। বাংলার ভাস্কর্যেও তাই। কীর্তিমুখ শিল্পে তার বিরাট সাধনা থাকলেও তা তার নিজস্ব নয়। ছত্রমুখ শিল্পই বাংলার নিজস্ব বস্তু। সেখানে তার কোনো বাহুল্য নেই, অথচ কী গভীর ও কী অপূর্ব তার ব্যঞ্জনা।

বাংলার এই নিজস্ব সম্পদ বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে কতক পরিমাণে ধরা দিয়েছে। 'কতক' এইজন্য যে তার মধ্যে সারা ভারতের সংস্কৃত-প্রভাব খানিকটা রয়েই গেছে। মহাপ্রভু বা কবিরাজ গোস্বামীর মত মনীষীর দল বিধিধর্মকে সরিয়ে রাখবার কথা যতই বলুন না কেন তবু বিধি ও শাস্ত্র বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেকখানি কায়েম রয়েই গেল। সেই মুক্তি পেলেন শাস্ত্রহীন জাতিপঙ্‌ক্তিহীন বাউলের দল। তাঁরাই বাংলার প্রাকৃত প্রাণসম্পদের সন্ধান পেলেন। মানবীয় ভাবরসই তার মর্মকথা। পরিপূর্ণভাবে তার প্রকাশ দেখা পেল তার আউল বাউল প্রভৃতি তত্ত্বের ঐশ্বর্যে। তাই হল বাংলার আসল নিজস্ব দর্শন। চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ ছিলেন সহজের উপাসক অর্থাৎ বাউলমতের। মহাপ্রভুর উপর তাঁদের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। মহাপ্রভুর পূর্বেই এইসব সহজ বা মানবীয় প্রেমের মধ্য দিয়ে সাধনা বাংলাদেশে ছিল।

এদেশে প্রেম-সাধনা

বাউলদের তত্ত্ববাদকে একটু শ্রদ্ধার সহিত না দেখলে তার ভিতরের আসল মর্মটি ধরা সম্ভব হবে না। যেখানে সাধনার মূল হল জ্ঞান, সেখানে বিশ্লেষণ করতে করতে উপাস্য-উপাসকে এমন কি জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যেও কোনো ভেদ আর টিঁকতে পারে না। এই হল বেদান্তের অদ্বৈত। ভক্তির ক্ষেত্রে উপাস্য ও উপাসকে ভেদ না থাকলে চলবে কেমন করে? একা একা তো ভক্তি সম্ভবে না। তাই রামনুজ মাধ্ব নিম্বার্ক বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি ভাগবতদের মতে উপাস্য-উপাসক ভিন্ন। উপাস্য ভগবান হলেন ত্রিভুবনের অধিপতি রাজরাজেশ্বর, বৈকুণ্ঠ তাঁর রাজধানী। সমস্ত প্রকৃতির তিনি নিয়ন্তা। বিধিবিধান ও নিয়মগুলি

তাঁর দ্বার আগলাচ্ছে। কাছে যেতে হলে ওই সব নিয়মের দ্বারীকে মেনে যেতে হয়।

বাংলাদেশের প্রেমসাধনা এতটুকুতেই তৃপ্ত হল না। বাংলার প্রেমসাধক বাউল বললেন, "প্রেমই যদি হল তবে আর 'এক উচ্চ আর তুচ্ছ' থাকবে কেন? তিনি যদি আমাকে প্রেম করেন, তবে তাঁকেও আমার প্রেমলীলায় সমান হতে হবে। নইলে উচ্চস্থানে বসে যে দাবি তা তো প্রেম নয়। তা হল শক্তি ও বৈভবের জুলুম মাত্র। রাজাও যদি দাসীকে প্রেম করে, সেই মুহূর্তে দাসীর দাস্য-মোচন হয়ে সে স্বাধীন হয়ে যায়। কাজেই প্রেমলীলাময় প্রেমের সাধনায় তাঁর বৈকুণ্ঠ এমন কি মথুরার রাজসিংহাসন ছেড়ে ব্রজে এসে গোপ তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে সমান হয়ে যান। যতক্ষণ তিনি মানবীয়ভাবে ধরা না দিলেন ততক্ষণ তিনি আমাদের কে?"—

"ভগবানের দুই স্বরূপ। যেখানে তিনি সমস্ত চরাচরের চালক, যেখানে তিনি রাজা, সেখানে অলঙ্ঘ্য তাঁর বিধিবিধান। তা অস্বীকার করলে তো চলবে না। সেটা শক্তির ক্ষেত্র। বিজ্ঞান চায় শক্তি। তাই বিজ্ঞান সেই অলঙ্ঘ্য নিয়মগুলি আয়ত্ত ক'রে ব্যবহার করে। প্রকৃতি হতেই সে সর্ববিধ শক্তি আহরণ করে। সেই শক্তির বৈকুণ্ঠলোকে বা মথুরায় নিয়মেরা সব দ্বারী। তারা বিনা কারণে দ্বার ছেড়ে দেয় না।"

ভগবানের আর এক স্বরূপ হল তাঁর প্রেমলীলার মধ্যে। সেখানে তাঁর রাজ-ঐশ্বর্য বিধিবিধান নিয়ম সব সরিয়ে ফেলে সবার সঙ্গে সমান মানুষ হয়ে তিনি যোগ দিয়েছেন ব্রজের প্রেমলীলায়। এই রহস্যই বাউলদের সাধনার মূলে। তাঁরা বলেন, শক্তির ও ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রে তিনি অসীম অপার। সেখানে কেমন করে তাঁর নাগাল পাই। তাই যেখানে তিনি প্রেমের লীলার দায়ে আপনি এসে ধরা দিয়েছেন, সেখানেই আমরা

তাঁর সঙ্গ খুঁজে বেড়াচ্ছি। বাউল বলেন, বৈষ্ণবরা এই রহস্যের কিছুটা বুঝল, কিছুটা বুঝল না। শ্রীরাধিকা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভাবলীলা করলেন। সেখানে কোনো বাধা কোনো বিধির নিষেধ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরার সিংহাসনে বসে তখন শ্রীরাধিকা তাঁর কাছে যেতে চাইলেন! এ তো ব্রজের প্রেমলোক নয়, এ যে রাজরাজেশ্বরের নিয়মলোক। দ্বারী বাধা দিল। এই ভুলটি না করলে তো শ্রীরাধার এই দুঃখটুকু ঘটত না। তাই বলি, তাঁরা প্রেমলোক ও বিধিলোকের মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে ফেললেন। মানবতত্ত্ব বুঝতে হলে রসিক হতে হবে। বাউলেরা সেই রসেরই রসিক।

মহাপ্রভু ও কবিরাজ গোস্বামীর মধ্যে এই বাউল মরমটি ছিল। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা গেল প্রেমময় যে প্রেম চান তা যেন ঐশ্বর্য-শিথিল না হয়।

ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥১

বৈষ্ণবেরাও ভগবানের বাণী শুনতে পেলেন—

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
... ...
আপনাকে বড় মানে আমারে সম, হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
... ...
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক, তুমি আমি সম ॥২

এই কবিতাগুলি আগেও বলা হয়েছে, তবু প্রসঙ্গবশে আবার বলতে হল।

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ। (২) ঐ, ঐ, ঐ

সাধনার বলে বা শাস্ত্রবিধির পথে কি এই প্রেমকে কেউ পায়? এই প্রেম জীবনে পাওয়া যে বড়ই ভাগ্যের কথা।

কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥১

প্রেমলীলার এই রহস্যময় লোকে বাংলাদেশের বৈষ্ণবেরা অন্য প্রদেশের বৈষ্ণবদের চেয়ে অনেক বেশি গভীরভাবে প্রবেশ করলেন। এই ভক্তিরহস্য শাস্ত্রতর্কের অগোচর।

তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব ।২

... ...

শাস্ত্র পড়ে লোক বড় জোর হয় "ঘটপটিয়া" মূর্খ। অর্থাৎ মূর্খত্ব থাকেই, শুধু শাস্ত্রের দ্বারা তাকে জমকালো করা হয়। বাংলাদেশের বৈষ্ণবদের মধ্যে তাই শাস্ত্র ছেড়ে কেউ কেউ প্রেমের পথকেই ধরে রইলেন। কেউ কেউ আবার শাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে পারলেন না। তাই চৈতন্যচরিতামৃত এই দুরকম ভক্তের কথাই বলেছেন—

বিধিভক্ত রাগভক্ত দুইবিধ নাম ॥৩

বিধিভক্ত ও রাগভক্তদের সাধনার যে বৈচিত্র্য তার বিষয়ে মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিলেন।

বিধিভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥৪

যে সাধক অনুরাগকে আশ্রয় করেছে, সে

বিধিধর্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ ॥৫

তার পক্ষে

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ॥৬

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ। (২) ঐ, অন্ত্য, ৩য়। (৩) ঐ মধ্য, ২৪শ। (৪) ঐ, ঐ, ২২শ। (৫) ঐ, ঐ, ঐ। (৬) ঐ, ঐ, ঐ।

আর

শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।১

তবেই দেখা গেল বাংলার বৈষ্ণব-সাধনার উপর এখানকার স্থানীয় প্রেমসাধনার গৌরব কম প্রভাব বিস্তার করে নি। তবু বাংলার বৈষ্ণবেরা শেষ পর্যন্ত শাস্ত্র ও বিধি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারলেন না। তাই বাউলরা বলেন, "বৈষ্ণবেরা এই পথে কতকটা এসেই পথের মাঝে থেমে গেলেন।"

দ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি বিচারে বাউলেরা মাথা ঘামায় না। কারণ তুই না হলে প্রেম হয় না। আবার তুয়ে এক না হলেই বা প্রেম কিসের? তাই বাউলদের জানাই আছে—

প্রেমে দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ ঘুচেছে।

তুইকে এক করতে না পারলে আর প্রেম কি?

নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম।

কাজেই বাউলদের প্রেমের মধ্যে জ্ঞানের অদ্বৈতবাদকেও এসে প্রকারান্তরে ডুবে যেতে হয়।

এই প্রেম সব বিধি-বিধানের অতীত, শাস্ত্রযুক্তির অতীত বলেই বাউলেরা বিধিবিধান ও শাস্ত্রযুক্তি সব দিলেন উড়িয়ে। আগেই বলা হয়েছে সাধারণ নিয়মে যে-সব ভাব ও বস্তু পরস্পর-বিরুদ্ধ, প্রেমের মধ্যে তা সবই সংগত হয়ে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। তাই চৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

বাহিরে বিষম জ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়

কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।২

কারণ এই প্রেমে—

বিষামৃত একত্র মিলন।৩

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২২শ। (২) ঐ, মধ্য, ২য়। (৩) ঐ, ঐ, ঐ।

মানবজীবনের প্রেমেও তো এইসব মহাসত্যের সন্ধান মিলেছে। এই জীবনেও মানুষ দেখেছে, প্রেমের অনেক দুঃখ। তবু প্রেম পেয়ে যে বেদনা তার চেয়ে বড় বেদনা জীবনে প্রেমের ব্যথা না পাওয়া। তাই প্রেমের বেদনা না পেয়েও সেই ব্যথা পেয়েছে বলেই লোকদেখানো কাণ্ড করতে হয়, কারণ তাতেও অন্তত কিছু সৌভাগ্য-পরিচয়। তাই মহাপ্রভু বললেন, "হরিতে একটুও প্রেম নেই, শুধু সৌভাগ্য দেখাবার জন্য আমার এই কান্না।"

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ॥১

এই বক্র-মধুর প্রেমের বেদনার কাছে নব কালকূটের গর্ব নির্বাসিত, আবার এর আনন্দ-নিস্যন্দের কাছে সুধার মাধুর্যাহংকার সংকুচিত—যার হৃদয়ে বিঁধেছে এই মধুর ব্যথা সেই এর বিষয় জানে।

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা গর্বস্য নির্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহংকারসংকোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো জাগর্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥২

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে দেখি রূপগোস্বামীকে রায় রামানন্দ সাহজিক প্রেমধর্ম জিজ্ঞাসা করছেন—

রায় কহে কহ সহজে প্রেমের লক্ষণ।
রূপগোসাঞি কহে সাহজিক প্রেমধর্ম ॥ ৩

সেখানে রূপগোস্বামী অপূর্বভাবে প্রেমের মর্মকথা বলছেন। যাঁর কৌতূহল আছে তিনি নিজে তা দেখবেন। উদ্ধৃত করে দেখাবার মত তো তা নয়। স্ববিরোধ বা বিরুদ্ধধর্মতা শুধু শাস্ত্রেই বিভীষিকা। সত্যকার জগতে সর্বত্রই আত্মবিরুদ্ধতা। তাই বাউলরা বলেন—

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২য়। (২) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২য়, তথা বিদগ্ধমাধব ২য়, ১৮শ শ্লোক। (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১ম।

এপিঠ ওপিঠ উল্‌টো কথা।
দুইয়ে মিলে সত্যি পাতা॥

ব্যক্তিত্বের মধ্যেও বিরুদ্ধতার অন্ত নেই। অবিরুদ্ধতা শুধু একটা শাস্ত্রগত কথার কথা। তাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্মময়॥১

এই কথাই রূপগোস্বামী তাঁর দানকেলিকৌমুদীতে (২য় শ্লোক) চমৎকার করে বলেছেন, বিভু হলেও প্রেম সদাই বেড়ে চলেছে, গুরু হলেও প্রেম গৌরবচর্যাহীন, মুহুর্মুহু বক্রিম হলেও প্রেম বিশুদ্ধ।

বিভুরপি কলয়ন সদাভিবৃদ্ধিং গুরুরপি গৌরবচর্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥২

প্রেমের মধ্যে এই বিরুদ্ধতা আছে বলেই প্রেমের পথে বড় বেদনায় বলতে হয়েছে—

পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর,
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর॥

এ যেন মানবপ্রেমেরই মরমকথা।

বলরাম দাস প্রেমের ধনকে দেখতে পেয়ে তার কোনো রূপবর্ণনা না করেই বললেন—

এরে হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঁই বলরামচিত কভু নহে থির॥

তার সঙ্গে আখরে বাউলেরা গাইলেন—

যুগে যুগে হেরেছি এই রূপ হেরেছি জনমে জনমে।
আমার অনুতে তনুতে এইরূপ, এইরূপ মরমে মরমে।
এরে কে কৈল বাহির।

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ। (২) ঐ, ঐ, ঐ।

যখন অন্তরে আছিল এইরূপ, তখন ছিল নয়ন পিয়াসী।
এখন নয়ন পেয়েছে এইরূপ, আমার অন্তর উদাসী—
এরে কে কৈল বাহির।
বাহিরে অন্তর কাঁদে অন্তরে বাহির,
তেঁই বলরাম চিত কভু নহে থির॥

এই দুই দিক সামলাতে না পেরেই মানুষ চিরদিন কেঁদেছে। প্রেমের এই ফ্যাসাদ পরব্রহ্মেও। প্রেমের মত তিনিও যে অসীম। অসীমতার লক্ষণই এই যে তাতে সর্ববিরুদ্ধতা সমাশ্রিত ও সুসংযুক্ত। তাই কবীর বলেন—

ভিতর কহূঁ তো জগময় লাজৈ বাহর কহূঁ তো ঝুঠা লো।
বাহর ভিতর সকল নিরন্তর চেত অচেত দউ পীঠা লো
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর বাতন কহা ন জাই লো।

বাংলার বাউল

বাংলার মাটির সঙ্গে তাঁদের যোগ রয়েছে বলেই, অন্তরে অন্তরে পরিপূর্ণ সহজ মানুষ অর্থাৎ প্রাকৃত বলেই বাউলেরা এমন প্রাণবন্ত। তাই তাঁরা বাইরের সব সাধনাকেও আত্মসাৎ করতে পেরেছেন। প্রাণের লক্ষণই হল এই আত্মসাৎ করবার শক্তি। বাংলায় যখন চিশ্‌তী-সুহরবর্দী-কাদিরী-নক্‌স্‌বন্দী প্রভৃতি সূফী সাধনা এল তখন হিন্দু মুসলমান এই দুই দলের পণ্ডিতদের কাছে মিলনের আশা ছিল না। ইটে ইটে মেলে না, মেলে কাদায় কাদায়। প্রাকৃতদের মধ্যে যোগ হলেও সংস্কৃতদের মধ্যে যোগ অসম্ভব। তাই বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। হিন্দুর শিষ্য মুসলমান, মুসলমানের শিষ্য হিন্দু—এমন করে পরম্পরা নেমে এসেছে।

এই বাউলদের পথেই দরবেশ, সাঁঙ্গ, কর্তাভজা, আউল প্রভৃতি সম্প্রদায় চলেছে।

বাউলেরা জাতিপঙ্‌ক্তি, তীর্থ-প্রতিমা, শাস্ত্রবিধি ভেখ-আচরণ মানেন না। মানবতত্ত্বই তাঁদের সার। মানবের মধ্যেই সর্ববিশ্বচরাচর, সেখানেই সাধনা। তাঁদের সাধনার মূল তত্ত্ব হল প্রেম। কাজেই ভগবানের সঙ্গে সমান হতে হবে। ভগবানও ঐশ্বর্যময় বিশ্বপতি হলে হবে কি, প্রেমে তিনি ধরা দিতেই ব্যাকুল। তাই বাউল বলেন—

জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিখারি।

এই বাউলেরা শাস্ত্রবিধি মানেন না। লোকে চেপে ধরলে বলেন, "মৃতের তো সামাজিক দায় থাকে না। মরলেই সব দায় ঘুচে যায়। তোমাদের দৃষ্টিতে আমাদের মৃত মনে কোরো।" এই জীবন্তে মরাকে সূফীরা বলেন ফনা। আর পাগলও তো কোনো নিয়মের ধার ধারে না। তাই তাঁরা দেওয়ানা বা পাগল। বাউল বা বাতুল কথার অর্থও পাগল। বাউলরা তাই গান করেন—

তাই তো বাউল হৈনু ভাই।
এখন বেদের ভেদ-বিভেদের
আর তো দাবি-দাওয়া নাই।

লোক-চলাচলের পথ বন্ধ্যা। তাতে ঘাসটুকুও জন্মাতে পারে না।

গতাগতের বাংঝা পথে,
আজায় না ঘাস কোনোমতে।

এই লোকাচারের বন্ধ্যা পথে বাউলরা অগ্রসর হতে নারাজ। তাই তাঁরা লোকপ্রচলিত বিধিও মানেন না আবার প্রাণহীন অবাস্তব তত্ত্বও বোঝেন না। তাঁরা চান মানুষ, কিন্তু সে মানুষ আস্ত মানুষ, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই পরিপূর্ণ মানুষই ব্যক্তি, ইংরেজিতে যাকে বলে পার্সনালিটি। তার মধ্যেই যে সব।

আদ্য অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই।

সমাজের ভগ্নাংশ যে মানুষ সে অবাস্তব তত্ত্বের মতই অলীক। আস্ত যথার্থ মানুষকেই মন চায়।

তত্ত্বে ফত্তে মন মানে না, মনের মানুষ চাইই চাই।

বাউল গগন তাই কেঁদে বেড়াত—

আমার মনের মানুষ যেরে, আমি কোথায় পাব তারে?

যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেখানে তো কামনা থাকতে পারে না। তাই বাউলেরা স্বর্গ বা মুক্তি কিছুই চান না, প্রেমময়কে তাঁরা নির্ভয়ে বলতে পারেন—

কূল না দিয়া ডুবাও যদি তাতেই আমি রাজি।

তাঁরা দুঃখকে ডরান না, সুখ বা স্বর্গও তাঁদের কাম্য নয়। সুখের বেতন যে চায় সে প্রেমপন্থী নয়। যে বেতন চায় সে দাসী। পত্নী হতে হলে বেতনের লোভ ছাড়তে হবে।—

দাসী ছিলি নারী হবি?
ছাড়তে হবে সকল দাবি।

আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন না করলে প্রেম-মহলের রহস্য-তালাই খোলে না।

আপনাকে তুই ছাড়িস যদি প্রেম-মহলের খবর পাবি।

এই প্রেমের পথে চলতে তাঁরা পরের বা সম্প্রদায়ের সমালোচনার ভয় করেন না।

আপনা পথের পথিক আমি কার বা করি ভয় গো।

লোকমত এবং সম্প্রদায়গুলিই তো ভগবানের দিকে যাবার প্রেমপথের সব বাধা।

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে।

বাউলেরা তীর্থ-প্রতিমার মত বিশেষ অবতারও মানেন না। তাঁদের মতে

সবই যে তাঁর অবতার।

গেরুয়া বা বাহ্য কোনো ভেখও তাঁরা মানেন না।

ভিতরে রস না হৈলে কি বাইরে কিরে রঙ ধরে?

খাঁটি প্রেম পরশ-পাথরের মত, তার পরশে জীবনের সব কাম সেবাতে পরিণত হয়ে যায়।

প্রেম আমার পরশমণি
তারে ছুঁইলে যে কাম হয় রে সেবা।

প্রেম অসীম ও প্রাণময়। সেই অসীম প্রেম মানবেরই মধ্যে।—

আছে তোরই ভিতর অসীম সাগর,
তার পাইলি নে মরম।

এই জীবন্ত প্রেম কি মৃত শাস্ত্রের কাছে মেলে? তার খবর মেলে জীবন্ত মানুষের কাছে। তাঁরাই গুরু। শাস্ত্রভারগ্রস্ত গুরু হলে চলবে না, চাই প্রেমে-প্রাণে-রসে ভরপুর গুরু। তিনি যে বিশেষ একটিমাত্র মানুষ তা নয়। নিখিল চরাচরের সব-কিছুই গুরু হয়ে আমার অন্তরে দিনের পর দিন অনন্তকাল ধরে সেই দীক্ষা দিচ্ছেন। তাই বাউলদের

অথিক গুরু পথিক গুরু, গুরু অগণন।
গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?

প্রেমের সাধনায় রূপের মরমে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু রূপে বাঁধা পড়লে কি উপরে-উপরে ভেসে বেড়ালে সর্বনাশ। রূপের তরঙ্গে ভেসে বেড়ানোর মত দুর্গতি আর নেই। গুরু শেখাবেন, এই তরঙ্গের নীচে অতলের গভীরতায় ডুবতে।

ডুবতে কিরে পারে সবাই
　　রূপতরঙ্গে যায়রে ভেসে।
মরমের পথ পাইলো না যে
　　রূপেই ভাসায় আপনারে সে॥

সেখানে ইন্দ্রিয়-দৃষ্টি দিয়ে চলবে না। চর্ম-দৃষ্টির জায়গায় মর্মদৃষ্টি পেতে হবে। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ॥[১]

বাউল বললেন—

নয়ন দেখে গায়ে ঠেকে ধূলা আর মাটি।
প্রাণরসনায় দেখরে চাইখ্যা রসের সাঁই খাঁটি॥

সেই অতলের অন্ধকারলোকে সূর্যচন্দ্রের আলোক তো পশে না। দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে তবে সেখানে 'দরশ' মেলে, তাই তাঁদের আশীর্বাদ—

দুখে দুখে জ্বলুক্ রে আগুন।
পরান ফাইট্যা আঁধার কাইট্যা
　　বাইরৌক রে আগুন।

এই প্রদীপ জ্বালিয়ে বাউল দেখলেন, জীবন ও পূজা আমরা যে আলাদা করেছি তাতেই সর্বনাশ ঘটেছে। পূজা ও জীবন কি আলাদা? দুধ নষ্ট হলে তবেই ছানা আর জল আলাদা হয়ে যায়।

আমাদের জীবন থেকে ভগবানকে নির্বাসিত করে রেখেছি। সেই জেলখানার নামই ঠাকুরঘর। সেখানে দিনের মধ্যে এক-আধটুকু সময় গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা বা মোলাকাত করে আসি। তার নামই হল সন্ধ্যা-পূজা! এইটুকু মোলাকাতেই মন তৃপ্ত হবে! যদি তিনি প্রেমময় প্রাণেশ্বর তবে তাঁকে সর্বকাল ও জীবনের সর্বস্থান ছেড়ে দিতে হবে না?

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৫ম।

ও তোর কিসের ঠাকুরঘর ?
(যারে) ফাটকে তুই রাখলি আটক
তারে আগে খালাস কর।

লোকে সেকালে ফাঁদ দিয়ে শিকার ধরত। এখনও লোকে সেই আদিম মনোবৃত্তি ছাড়তে পারে নি। তাই প্রেম দিয়ে বাঁধবার বদলে আমরা ভগবানকে মন্ত্রে তন্ত্রে আচারে বাঁধতে যাই। রূপে প্রসাধনে প্রিয়তমকে বাঁধবার চেষ্টার মধ্যেও সেই আদিম মনোবৃত্তিই ধরা দিচ্ছে। বাউল বলেন—

মন্ত্রে তন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ
দেবে সে কি ধরা ?
উপায় দিয়ে কে পায় তারে
শুধু আপন ফাঁদে মরা।

এই প্রেমের সাধনা বিরাট। তা অসাধ্য হত যদি এ সাধনায় তিনিও যোগ না দিতেন। তিনি অরূপ, আমি রূপ। তিনি অরূপ বলেই প্রেমের খেলায় তাঁর প্রয়োজন আছে আমার রূপে।

আজি আমার সঙ্গে তোমার হোরি
ওগো রসরায়।
আমার একলা দায় নহে গো,
রয়েছে যে তোমারো দায়।
তোমার সুখের চাইতো হাসি
তোমার ফুঁকের চাইতো বাঁশি
আমার অঙ্গে তোমার বিলাস,
তাই ধরতে যে হয় আমারো পায়॥

কি সাহস! তিনি ধরবেন পায় ? প্রেমের দায়ে ধরবেন বৈকি ? এমন না হলে মানবের প্রেম তিনি পাবেন কেমন করে ?

আমি শুধু তাঁর খেলার দোসর নই। তাঁর আনন্দরস-সম্ভোগের একমাত্র সম্ভাবনাও যে আমারি মধ্যে। আমাকে ছাড়া তিনিও যে তাই অসম্পূর্ণ। প্রেমে আনন্দে আমরা পরস্পরে যুক্ত। আমি কমল, তিনি তার মধুরসিক ভ্রমর। কাজেই আমাকে ছাড়া তাঁরও তো চলে না। আমার এই হৃদয়কমল যুগযুগান্ত থেকে বিকশিতই হচ্ছে, এর তো শেষ নেই। কাজেই সেই রসের দায়েই তাঁর সঙ্গে আমার অনন্ত কালের বাঁধন। ইচ্ছা করলেই কি তিনি মুক্তি পেতে পারেন? মুক্তি তাঁরও নেই আমারও নেই। প্রেমের জগতে 'মুক্তি' কথার মানেই নেই।

হৃদয়-কমল চলছে গো ফুটে কত যুগ ধরি।
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি?

তাই বাউলই জোর করে তাঁর প্রেমময়কে বলতে পারেন—

যদি আমায় ছাড়া ওগো রসিক
তোমার প্রেমের লীলা চলে,
তবে এখান থেকেই দাওগো বিদায়,
আমি বস্‌ব না তা বলে।
হাটের ধূলায় মাঠের তাপে
আমি চলতে যে আর নারি।
তুমি প্রেমের দায়ে লবে খুঁজে,
জানি হৃদ্‌বিহারী,
তাই বসলেম এবার পথে।

দীন দুঃখী শাস্ত্রজ্ঞানহীন বাউল, তার এত আস্পর্ধা! কোন সাহসে সে প্রেমময়ের প্রেমের খেলায় সাথী হতে সাহস করে? তার কোনো গুণ নেই বলেই তার এই সাহস। তার হেতুটিও অপূর্ব ভাষায় তাঁরাই বলছেন—

ধন্য আমি শূন্যকুম্ভ পূর্ণকুম্ভ নই।
তাইতে তোমার জলের খেলায়
তোমার বুকের তলে রই গো সখি—
বুকের তলে রই।
... ...
যারা তোমার পূর্ণকুম্ভ, তাদের রাখ গো তীরে,
কাজের লাগি লইয়া গো যাও, যখন যাও ঘরে ফিরে।
আমি নাচি তোমার সাথে আনন্দ-নীরে।
আমায় তুমি বাঁধ্‌লা প্রেমের বাহুতে ঘিরে।
(তাই) জল-তরঙ্গে (তোমার) বুক-তরঙ্গে
নাইচ্যা আকুল হই।

জলের মধ্যে মেয়েদের স্নানলীলায় ভরা-কলসীগুলো তোলা থাকে উপরে। শূন্যকুম্ভ বুকের নীচে করেই তাঁরা জলকেলিতে মত্ত হয়ে ওঠেন। সংসারে পূর্ণকুম্ভ যাঁরা আছেন, তাঁরা থাকুন সংসারের কাজের জন্য ঘাটের উপরে। এইসব বাউলদের দল হলেন শূন্যকুম্ভ। তাই তাঁরা কাজের অযোগ্য। তাঁরা শুধু জলের খেলায় তাঁর বুকের তলে থাকবার অধিকার পেয়েই ধন্য হয়েছেন। খ্যাতি প্রতিপত্তি শাস্ত্রবিধি সব হারিয়ে একেবারে শূন্যকুম্ভ হয়ে যদি প্রেমের খেলায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গটি লাভ করা যায় তবে জীবনে আর কি প্রার্থনীয় থাকতে পারে? বাংলায় সহজ পথের পথিক এইসব ভারমুক্তের দল প্রেমময়ের সেই লীলারস সম্ভোগ করে চরিতার্থ হয়ে গেছেন। এই লীলার আনন্দ যে জেনেছে, তার কাছে পুঁথিপত্র শাস্ত্রজ্ঞান সামাজিক সম্মান সবই তুচ্ছ। তখন মনে হয়, জন্ম-জন্মান্তরের কোন সুকৃতির ফলে এই শূন্যকুম্ভ হওয়া যায়? বাংলাদেশের এই শূন্যকুম্ভের দল যে দর্শন দেখেছেন তার চেয়ে অপূর্ব দর্শন কি আর কিছু আছে? লোক-প্রচলিত শাস্ত্রের দর্শনে বাংলাদেশ অন্যের অনুবর্তী;

আর এই অন্তর-দর্শনে বাংলাদেশই অন্যকে পথ দেখাতে পারে। এ দর্শনটি পেতে হলে শাস্ত্রবিধি-লোকাচারের বাঁধা পথে কিছু ফল হবে না। তবে কেমন করে মিলবে সেই সন্ধান? বারো পুরুষ আগে পূর্ববঙ্গে বাউল সাধক আত্মনাথ বাংলাদেশের সেই আসল দর্শনটুকুর সন্ধান এবং পরিচয় রেখে গেছেন।

গুরুর হাতের প্রদীপ লৈয়া
দেখরে অথাই গুহায় বৈয়া,
আত্মযোগে সচেত হৈয়া
তবে পরম মরম পাবি।
(দেখবি) সরস দরশ হৃদ্‌মাঝারে
(আবার) অপার চৌদ্দ ভুবন-পারে।
যোগলীলা তোর সহস্রারে
আত্ম-নাত্ম ভেদ ঘুচাবি।

এই জন্যই তো চণ্ডীদাস বলেছেন,

সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

এই ধারার অন্ত কোথায়?

বাংলাদেশের এই অপূর্ব মানব-সাধনা কি বাউলদের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে? আজও কি বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাধকদের মধ্য দিয়ে এইসব সাধনাকে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না? যদি বাংলাদেশের এই সাধনা সত্য হয় তবে কোনোকালে তার বিনাশ নেই। বৈষ্ণব-বাউলভাবে প্রেমময়কে যে বাংলাদেশ মানব-ভাবের মধ্যে পেয়েছেন আজই তো তার সব চেয়ে

বেশি প্রয়োজন। বিধাতার সর্বোত্তম লীলা এই নরলীলারই আজ চলেছে মহা দুর্গতি। বাউল-বৈষ্ণব বাংলাদেশ চুপ করে তা দাঁড়িয়ে দেখবে? সবাই যে বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপনশীল দেবতার প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। সেই এক প্রেমের সাধনায় মানুষ চিন্ময় হয়ে উঠবে, সব স্বার্থ দ্বেষ দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে। শাক্তভাবে বাংলাদেশ সকলকে একই জগজ্জননীর সন্তান বলে জানলে আজ আর হিংসা-বিদ্বেষের স্থান থাকবে কোথায়? মাকে মন্দিরে কয়েদ করে রাখলে বটে বাইরে এই মারামারি করা চলে। কিন্তু মাকে নিয়ে যে বাংলাদেশ ঘর করেছে। তবে এই মারামারির কি কোনো স্থান আছে?

এইজন্যই এই যুগেও বাংলাদেশে একে একে রামমোহন, মহর্ষি, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রভৃতি সেই একই সত্যকে বারবার ঘোষণা করে গেছেন, সে সাধনা এখনও চলেছে। হিংসাবিদ্বেষ-জর্জরিত এই যুগে তাই বিধাতা একের পর এক সাধককে এই বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। সমস্ত বিশ্বের জন্য তাঁদের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথও এইজন্যই এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর সাধনা দেশের বুকে চিরকালের জন্য রেখে গেলেন। জড়বাদী যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে মানব-জগতের আর যে কোনো আশা নেই, জগত হতে বিদায় নেবার বেলা তা বলে গেলেন তাঁর ‘সভ্যতার সংকটে’। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উপর ভরসা করে পড়ে থাকলে চলবে না। মানবের চরম সাধনা করতে হবে।

মানবের এই দুর্গতির দিনে মানবতা-ধর্মের চিরকালের সাধনাপীঠ বাংলারই মর্মবাণী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’তে। আজ জগতে মহামানবতার সেই বোধ না জাগলে আর কোনো পথ নেই। তারই একটি অঞ্জলিতে আজ বক্তব্য সমাপ্ত করা যাক—

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
    সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে
    কেন আছিস ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—
    দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
        করছে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
        খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
        আয় রে ধুলার 'পরে।

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি,
    মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
    বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলা-বালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
    ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

পরিশিষ্ট

মহাপ্রভুর অভিনয়লীলা

যাহার লীলা দেখাইতে হইবে তাহার দ্বারা আবিষ্ট হওয়াই হইল অভিনয়ের মর্মকথা। এই আবিষ্ট হইবার অসাধারণ শক্তি মহাপ্রভুর ছিল। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আছে, পুরীধামে মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য গৌড়ীয় ভক্তগণ সমাগত। সেই উপলক্ষ্যে কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিনে মহাপ্রভু নন্দমহোৎসবের আয়োজন করিলেন এবং সেই উৎসবে গোপবেশ ধারণ করিয়া ভাবের আবেশে সেই লীলার অপরূপ অভিনয় করিলেন।

কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তনব ॥
দধিদুগ্ধভার সবে নিজ স্কন্ধে করি।
মহোৎসব-স্থানে আইলা বলি হরি হরি ॥
কানাই খুঁটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতী হৈয়াছেন ব্রজেশ্বরী ॥
... ...
অদ্বৈত কহে সত্য করি না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ ॥
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বারবার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা ॥

পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥
হনুমানবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ॥[১]

এইসব বিবরণে দেখা যায়, মহাপ্রভু যখন কোনো পৌরাণিক ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইতেন তখন নিজের সত্তা পর্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। অভিনয়ের পক্ষে এরূপ ভাবাবিষ্ট হইতে পারা একটা খুব বড় কথা। কাজেই বুঝাই যায় মহাপ্রভু চমৎকার অভিনয় করিতে পারিতেন।

এই বিষয়ে অনুমান বা কল্পনার কোনো প্রয়োজন নাই। সেই যুগের বিশ্বাসযোগ্য ভক্তগণের লেখা হইতেই এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ মিলিতে পারে।

কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর অভিনয়বিষয়ে বিশেষ তথ্য দিয়াছেন তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে। চৈতন্যচরিত সম্বন্ধে কবিকর্ণপূরের বলিবার অধিকার ছিল অসামান্য। তিনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিবানন্দের পুত্র; মহাপ্রভুকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, বাল্যকালে তাঁহার স্নেহ ও কৃপা লাভ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তাই চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের উপসংহারে কবিকর্ণপূর বলেন, 'বাল্যকালে যাঁহার কৃপালাভ করিয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যের কথা যেমনটি দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহাই তাঁহার কৃপায় যথামতি এই গ্রন্থে একটুখানি প্রকটিত করিলাম'—

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাবর্ণিতং
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৫শ।

'মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে তাঁহার অনুরাগী ভক্তগণের মধ্যে বাস করিয়া তাঁহাদের দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়াছি।'

দৃষ্টা ভাগবতাঃ কৃপাপ্যুপগতা তেষাং স্থিতং তেষু চ।

কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে বাংলাদেশের সাধনার মর্মকথাটি হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছেন। প্রেম বলিতেছেন, 'সহজভাবই আপনা হইতে বলবান। যতই চেষ্টা কর না কেন কৃত্রিম ভাবকে সে হটাইয়া দিবেই।'

স্বতো বলীয়ঃ সহজো হি ভাবঃ
স কৃত্রিমং ভাবমধঃ করোতি ॥[১]

কাজেই জ্ঞান ও বিদ্যা হইতে তিনি প্রেম-ভক্তিকেই বড় মনে করেন। কবিকর্ণপূর বলেন, 'হরিভক্তিই বিদ্যা, বেদাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য বিদ্যা নহে।'

কা বিদ্যা হরিভক্তিরেব ন পুনর্বেদাদিনিষ্ণাততা।[২]

মহাপ্রভুর সময়ে ভক্ত সাধকদেরও মত ছিল 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি নয়'। তাঁহারাও চাহিয়াছিলেন—

অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।
... ...
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

---

(১) ৩য় অঙ্ক। (২) ৭ম অঙ্ক।

রামানন্দমুখে কবিকর্ণপূর শুনাইতেছেন—

আস্থা তস্য প্রণয়রভসস্তোপদেহে ন দেহে
যেষাং তে হি প্রকৃতিসরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ ॥১

অর্থাৎ "বাহ্য বস্তুতে নয়, তাঁহার প্রেমানন্দ-রসাস্বাদনেই যাঁহাদের অনুরাগ সেইসব প্রকৃতিসরস অর্থাৎ স্বভাব-প্রেমিকেরাই মুক্ত। যাঁহাদের লোকে মুক্ত মনে করে সেইসব বৈরাগ্যপরায়ণ শুষ্ক যোগী তপস্যাচারীরা তো মুক্ত নহেন।"

এইসব মত যে তখন শুধু কবিকর্ণপূরেরই ছিল তাহা নহে; তখন সকল ভক্তগণেরই এইরূপ মতামত ছিল। তাই নাটকের সমাপ্তিবাক্যে কবিকর্ণপূর বলেন—

দৃষ্টা ভাগবতাঃ কৃপাপ্যুপগতা তেষাং স্থিতং তেষু চ,
জ্ঞাতং বস্তু বিনিশ্চিতঞ্চ কিয়তা প্রেম্নাপি তত্রাসিতম্।

ইহার অনুবাদও বৈষ্ণব ভক্তগণের অনুবাদগ্রন্থ হইতেই দেওয়া যাউক—

চৈতন্যের সঙ্গে যত মহা মহা ভাগবত,
তাঁ সভারে সাক্ষাতে দেখিনু।
আমা অভাগার প্রতি কৃপা তাঁরা কৈল অতি
তাঁর সঙ্গে নিবাস করিনু ॥
সঙ্গে থাকি তাঁ সভার বস্তু বিনিশ্চয় তাঁর
তত্ত্বজ্ঞান হইল আমার।২

এই অনুবাদটি প্রেমদাসের। ইঁহার পূর্ব নাম ছিল শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্র। ইনি ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন।

---

(১) ৭ম অঙ্ক। (২) পৃ ২৫০।

যোলশত চৌত্রিশ শকে লৌকিক ভাষাতে সুখে
প্রেমদাস করিল লিখন।১

১২৯২ সালে আহিরীটোলা হইতে মহেশচন্দ্র শীল এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করেন। কবিকর্ণপূরের মতামত বৈষ্ণবসমাজে অতিশয় মান্য। চৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামীও প্রমাণরূপে কবিকর্ণপূরের নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥
... ...
এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপসনাতনে॥২

কাজেই কবিকর্ণপূরের মতামত তখনকার দিনের সর্ববৈষ্ণবাচার্যগণের মান্য। সেইসব মহাভক্ত সাধক বৈষ্ণবাচার্যগণ গৌরচন্দ্রের নৃত্যে গীতে অভিনয়ে আসক্তি দেখিয়া তাঁহাকে জাহান্নমে পাঠান নাই। কবিকর্ণপূর দেখাইয়াছেন, "বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন নৃত্য করেন তখন করতালি-সহকারে শ্রীগৌরাঙ্গ গলা ছাড়িয়া গান করেন, আর গৌরচন্দ্র যখন নৃত্য করেন তখন সমান আনন্দে গান করেন বক্রেশ্বর।"

বক্রেশ্বরে নৃত্যতি গৌরচন্দ্রো
গায়ত্যমন্দং করতালিকাভিঃ।
বক্রেশ্বরো গায়তি গৌরচন্দ্রে
নৃত্যত্যসৌ তুল্যসুখানুভূতিঃ॥৩

মহাপ্রভু যখন পুরীধামবাসী তখন একদিন তাঁহার কাছে প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে

(১) পৃ. ২৫১। (২) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯শ।
(৩) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৪র্থ অঙ্ক।

রায় রামানন্দের কাছে পাঠাইলেন। একে রায় শূদ্র, তাহার উপর মিশ্র গিয়া শুনিলেন, রায় রামানন্দ 'বয়সে কিশোরী' 'পরমাসুন্দরী' 'নৃত্যগীতে সুনিপুণ' দুইটি কন্যাকে 'নিভৃতে উদ্যানে' লইয়া নিজ নাটকের গীত তাহাদের নৃত্যে মূর্তিমান করিয়া তুলিতেছেন। তাহাদের সাজসজ্জা-প্রসাধনও রামানন্দই করেন।

তাঁহা দোঁহে লৈয়া রায় নিভৃতে উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীত শিখায় নর্তনে॥
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জন।
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্বাঙ্গ মণ্ডন॥১

কিন্তু ভক্তিপূত রায়ের মন নির্বিকার।

তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।২

রামানন্দ কলাবিদ্যায় নিষ্ণাত। তাই রায়

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥৩

রায় শূদ্র বলিয়াও বোধহয় মিশ্র বিরূপ ছিলেন। তারপর এই সব ব্যাপার। দেখিয়া-শুনিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায়ের কাছে কৃষ্ণকথা না শুনিয়াই ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুকে সব কথা জানাইলেন।

শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা।
... ...
রামানন্দের রায়ের কথা শুন সর্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য কথন॥

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৫ম। (২) ঐ। (৩) ঐ।

একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করায় আপনি ॥
... ...
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥
আমিও রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাও তথা ॥১

তখন প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে আবার রামানন্দের কাছে যাইতে হইল; সেদিন ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকথা শুনিয়া মিশ্র মুগ্ধ হইলেন। মহাপ্রভুকে বারবার এইজন্য ধন্যবাদ জানাইলেন।

মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥
রামানন্দ রায় কথা কহিলে না হয়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তি রসময় ॥২

কাজেই নৃত্যগীত-অভিনয়ে যেমন কলাবান ও রসজ্ঞ ছিলেন মহাপ্রভু, তেমনি ছিলেন রায় রামানন্দ প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গের দল। প্রবীণ অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ প্রভৃতিও এই সব বিষয়ে কম রসিক ছিলেন না।

বৃদ্ধ ভক্ত অদ্বৈতাদি সুহৃদ্‌গণেরও মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া প্রেমের সিন্ধু যতীন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ পুনঃপুনঃ নৃত্যানন্দে প্রেমরসে নিমজ্জিত থাকিতেন।

অদ্বৈতাদ্যৈরখিলসুহৃদাং মণ্ডলৈর্মণ্ড্যমানো।
সিন্ধুঃ প্রেম্নামযমিহ নরীনর্তি গৌরো যতীন্দ্রঃ ॥৩

নৃত্যগীত অভিনয় করা সত্ত্বেও শ্রীগৌরাঙ্গকে এইসব বৈষ্ণবাচার্যগণ যতীন্দ্র বা সাধকশ্রেষ্ঠ বলিতে সংকুচিত হন নাই। মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমরসরসিক মিত্রমণ্ডলীকে লইয়া (প্রিয় সম্প্রদায়ৈঃ) নাচিয়া গাহিয়া

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৫ম। (২) ঐ, ঐ ঐ। (৩) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৮ম অঙ্ক।

অভিনয় করিয়া অন্তরের বেদনা উদ্‌ঘোষিত করিয়া ত্রৈলোক্যকে আনন্দ-সাগরে ডুবাইয়াছেন।

গায়ন্ নটন্ অভিনয়ন্ বিরুদন্ অমন্দম্।
আনন্দসিন্ধুষু নিমজ্জয়তি ত্রিলোকীম্ ॥১

শ্রীগৌরহরির প্রেমভক্তি প্রভৃতি অলৌকিক ঐশ্বর্যলীলা চমৎকার। তাহা অপেক্ষাও লোভনীয় হইল তাঁহার এইসব নৃত্য-গীত-অভিনয়াদির লৌকিকী লীলা। গঙ্গা যখন মহেশশিরে, তখন তিনি পরম-পবিত্রা, নির্মলা। কিন্তু সেখান হইতে যখন গঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণা তখনই তিনি আনন্দরসের বন্যা যান বহাইয়া। তখনই তাঁহার নাগাল আমরা পাই।

অলৌকিকীতোঽপি চ লৌকিকীয়ং
লীলা হরেঃ কাচন লোভনীয়া।
মহেশশীর্ষাদপি ভূমিমধ্যং
গতৈব গঙ্গা মুদমাতনোতি ॥২

মহাপ্রভুর সেই নৃত্য-গীত-অভিনয়লীলা দেখিয়া মনে হয়, "ইনিই কি আনন্দের প্রত্যক্ষ মূর্তি, ইনিই কি পরম প্রেমের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, ইনিই কি মূর্তিমতী শ্রদ্ধা, অথবা ইনিই কি স্বরূপিণী দয়া, ইনিই কি মাধুর্যের প্রত্যক্ষরূপ, নববিধাভক্তি কি ইহাঁরই তনুখানিকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ হইল?"

আনন্দঃ কিমু মূর্ত এষ পরমঃ প্রেমৈব কিং দেহবান্
শ্রদ্ধা মূর্তিমতী দয়ৈব কিমু বা ভূমৌ স্বরূপিণ্যসৌ।
মাধুর্যং নু শরীরি কিং নববিধাভক্তির্গতৈকাং তনুম্...৩

এই লীলাস্থলে যে ভক্তি আবির্ভূতা, "তিনি অন্তরকে করেন প্রসন্ন, ইন্দ্রিয়গণকে করেন পরিশুদ্ধ। অর্থ বা কামের তো কথাই নাই, মোক্ষকেও

(১) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ১ম অঙ্ক। (২) ঐ, ২য় অঙ্ক। (৩) ঐ, ৪র্থ অঙ্ক।

দেন তুচ্ছ করিয়া, শুধু সন্নিহিত হইয়াই জীবমাত্রকে আনন্দসিন্ধুর অতল তলে ডুবাইয়া দিয়া সদ্যই করেন কৃতার্থ।"

অন্তঃ প্রসাদয়তি শোধয়তীন্দ্রিয়াণি
মোক্ষঞ্চ তুচ্ছয়তি কিং পুনরর্থকামৌ।
সদ্যঃ কৃতার্থয়তি সন্নিহিতৈব জীবান্
আনন্দসিন্ধুবিবরেষু নিমজ্জয়ন্তী ॥১

এই গৌরাঙ্গ যখন চলিয়া গেলেন তখন জগন্নাথধাম যেন শূন্য হইয়া গেল। সেই নীলগিরি, সেই বৈভব, সেই গুণ্ডিচা বা রথযাত্রা, সেই সব নানা দিগ্‌বিদিকের ব্যাকুল তীর্থযাত্রী, সেই সব নন্দনবন হইতেও উৎকৃষ্ট উদ্যান, সবই আছে, কিন্তু মহাপ্রভু বিনা সবই যেন শূন্য।

সোহয়ং নীলগিরীশ্বরঃ স বিভবো যাত্রা চ সা গুণ্ডিচা
তে তে দিগ্বিদিগাগতাঃ সুকৃতিনস্তাস্তা দিদৃক্ষার্ত্তয়ঃ।
আরামাশ্চ ত এব নন্দনবনশ্রীণাং তিরস্কারিণঃ
সর্বাণ্যেব মহাপ্রভুং বত বিনা শূন্যানি মন্যামহে ॥২

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রস্তাবনায় দেখি, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রিয়পার্ষদস্য শিবানন্দসেনস্য তনুজেন নির্মিতং পরমানন্দদাস কবিনা····· শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ং নাম নাটকম্।

কবিকর্ণপূরের আসল নাম পরমানন্দ। তিনি মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় সেন শিবানন্দের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র। কাঁচড়াপাড়ায় তাঁহার জন্ম। তাঁহার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে আদর করিয়া পুরীদাস নাম দেন। মহাপ্রভুরই নির্দেশে বালকের নাম রাখা হইয়াছিল পরমানন্দ। পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর অশেষশ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাই এই বালকের নাম হইল পরমানন্দ দাস।

(১) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক (২) ঐ, ১ম অঙ্ক।

বাল্যকাল হইতেই এই পরমানন্দদাসের ছিল অপূর্ব প্রতিভা। সংস্কৃতে ও কাব্যরচনায় তাঁহার অসামান্য অধিকার। অলঙ্কারকৌস্তুভ তাঁহার রচনা। চৈতন্যচরিতামৃত নামে এক সংস্কৃত মহাকাব্য তিনি রচনা করেন। গদ্যপদ্যময় আনন্দবৃন্দাবনচম্পূও তাঁহারই রচিত। এইসব কাব্যই ভারতের সর্বত্র সম্মানিত, কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রধান কৃতিত্ব হইল চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৪ শকে তাহা রচিত হয়। গ্রন্থসমাপ্তিতে তিনি বলেন, ১৪০৭ শকে গৌরহরি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এবং ১৪৯৪ শকে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ৩৯ বৎসর পরেই চৈতন্যচন্দ্রোদয়-রচনা সমাপ্ত হয়।

শাকে চতুর্দশশতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরোহরি ধ'রণীমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলা-
গ্রন্থোঽয়মাবিরবভৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥

১০৬৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি মধ্যভারতের চন্দেল বংশীয় কীর্তিবর্মার রাজত্বকালে কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে একখানি রূপক নাটক লেখেন। রূপকনাটক অর্থে এই নাটকে জ্ঞান ভক্তি প্রেম প্রভৃতি মানবীয় চিদ্‌বৃত্তিগুলি মানবরূপ ধারণ করিয়া মানুষের মত কথাবার্তা অভিনয় প্রভৃতি করিতেছে। এই নাটকখানির সমাদর হইয়াছিল সারা ভারতে। দারাসুকোহ্ ইহার পারসী অনুবাদ করান। মৌলবী এ. বি. এম্. হবিবুল্লা Indian Historical Quarterlyতে ১৯৩৮ সালে মার্চ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন— Indo. Persian Literature। তাতে দেখা যায় ১৬৬২—১৬৬৩ সালে বনওয়ারীদাস ইহার পারসী অনুবাদ করেন। ইহার ছয় অঙ্ক পারসীতে হইয়াছে ছয় ঘমন। ইহার পারসী নাম গুলজার-ই-হাল। ইংলণ্ডের জন বেনিয়ান্ তাঁহার 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্'এ এই

পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন। সারা য়ুরোপে ও আমেরিকায় তাহা সমাদৃত। প্রবোধচন্দ্রোদয় যদিও লেখা হয় মধ্যভারতস্থিত খজুরাহোর রাজদরবারে, তবু কৃষ্ণমিশ্রের বাড়ি ছিল রাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামে। বর্ধমানের অন্তর্গত ভূরসুঠ গ্রাম বহু মহাপুরুষের দ্বারা পবিত্রীকৃত। কাজেই রূপকনাটক প্রবর্তনের বিশেষ প্রতিভা দেখা গেল এই বাংলাদেশেই। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামেই মনে হয় ইহাও কতকটা সেই কৃষ্ণমিশ্ররচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়েরই আদর্শে লেখা।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও ভক্তি মৈত্রী প্রেম প্রভৃতির লীলা দেখিতে পাই। মহাপ্রভুর চরিতলীলা দেখানই নাটকটির উদ্দেশ্য। নাটকের মধ্যে আর-একটি নাটক ভরিয়া দিয়া মহাপ্রভুর অভিনয়লীলা দেখান হইয়াছে। মহাপ্রভু যেমন অপূর্ব অভিনেতা তেমনই অসাধারণ অভিনয়কলাগুরু। মহাপ্রভুরই পরিচালনায় আচার্যরত্নের পুরাঙ্গণে যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে আগাগোড়া সব ব্যবস্থাই পরিচালিত হইয়াছিল মহাপ্রভুর দ্বারা।

দেখিতে পাই প্রশ্ন হইয়াছিল, এই অভিনয় হইবে কোথায় (সোজ্জেব কো পদেসো অর্থাৎ স এব কঃ প্রদেশঃ)? উত্তর হইল, আচার্যরত্নের পুরাঙ্গণে (আচার্যরত্নস্য পুরাঙ্গণম্)[১]।

এই নাটকে মহাপ্রভুর নির্দেশে শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্যকে কৃষ্ণের ভূমিকা লইতে হয়।

অদ্বৈতমাপাদয়দ্ ঈশবেশম্।২

স্বয়ং মহাপ্রভু লইয়াছিলেন শ্রীরাধার ভূমিকা।

স্বয়ঞ্চ রাধাকৃতিমগ্রহীৎ সঃ॥৩

(১) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৩য় অঙ্ক। (২) ঐ, ঐ। (৩) ঐ, ঐ।

ইহাতে সেই যুগে একটু আপত্তির মতও উঠিয়াছিল, "ঈশ্বরের অবতার হইয়া কেন তিনি তবে স্ত্রীভাবে নাচিবেন ?"

কধং দাব ঈসরো হুবিয় ইত্থীভাবেন ণচ্চিস্সদি। ১

তাহাতে উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, "বাছা, জান না ? ভগবান যে সর্বরসের রসিক।"

বালে ! ন জানাসি ! ঈশ্বরঃ খলু সর্বরসঃ। ২

ভক্তদের আশয়ানুরোধে তাঁহাকে নানা বিচিত্রলীলাই করিতে হয়।

সর্বেষাং ভক্তানামাশয়ানুরোধাদ্ বিচিত্রামেব লীলাং করোতি।৩

শুধু অভিনয় নহে, আগাগোড়া নাটকটির প্রয়োগ-পরিচালনও করেন মহাপ্রভু স্বয়ং। তাহাতেই বুঝা যায় এই কলাতে তিনি কত বড় নিপুণ আচার্য ছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে হরিদাস হইলেন সূত্রধার, মুকুন্দ হইলেন পারিপার্শ্বিক। বাসুদেব আচার্যকে লইতে হইল নেপথ্যরচনার ভার।

হরিদাসঃ সূত্রধারো মুকুন্দঃ পারিপার্শ্বিকঃ।
বাসুদেবাচার্যনামা নেপথ্যরচনাকরঃ ॥ ৪

শ্রীরাধাকৃষ্ণসংযোগকারিণী বৃদ্ধা ভগবতী যোগমায়ার অভিনয়ের ভার পড়িল শ্রীনিত্যানন্দের উপরে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণসংযোগকারিণী জরতীব সা।
যোগমায়া ভগবতী নিত্যানন্দতনুং শ্রিতা ॥ ৫

শ্রীবাসের কাছে মহাপ্রভুর আদেশ পৌঁছিল, "হে শ্রীবাস, খুব সাবধানে তুমি সবদিক সামলাইবে। ইহাতে যোগ্য রসিকজন ছাড়া কোনো বাজে লোক যেন না প্রবেশ করিতে পারে তাহা সাবধানে দেখিবে।"

(১) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৩য় অঙ্ক। (২) ঐ, ঐ।
(৩) ঐ. ঐ। (৪) ঐ, ঐ। (৫) ঐ, ঐ।

হে শ্রীবাস ! স্বয়মবহিতেনাদ্য ভাব্যং ত্বয়াস্মিন্
যোগ্যো যঃ স্যাং স বিশতি যথা নাপরস্তদ্বিধেয়ম্ ।

শ্রীবাস বোধহয় এই নাটকের কথা জানিতেন না। তাই আধা বলিতে না বলিতেই শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন কর্মে এইরূপ যোগ্যাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে ? কোথায় বা প্রবেশ করাইতে হইবে ?"

দেব, কস্মিন্ কর্মণি যোগ্যাযোগ্যব্যবস্থা করণীয়া ।
কুত্র বা প্রবেশঃ কারয়িতব্যঃ ।১

তখন মহাপ্রভুর কথাই শ্রীবাসের কর্ণে আসিল, স্বয়ং তিনিই রাধার অভিনয় করিবেন। আচার্যরত্নের অঙ্গনভূমিতে দেবীর রসলীলার আবির্ভাব হইবে।

শ্রীরাধাঽত্র স্বয়মিহমহো নূনমাচার্যরত্ন-
স্যাবাসস্যাঙ্গণভুবি রসাদ্ব্যক্তমাবির্ভবিত্রী ॥২

মহাপ্রভু স্বয়ং রাধিকার অভিনয় করিবেন, মনে মনে কিছুতেই ইহা শ্রীবাস বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনের সন্দেহ কিছুতেই ঘুচিতেছিল না। তবু মহাপ্রভুর বাক্যে কৃতনিশ্চয় হইয়া গঙ্গাদাস নামে মহাপ্রভুর পরম বিশ্বাসী ব্রাহ্মণোত্তমকে তিনি দ্বারপালকর্মে নিয়োজিত করিলেন।

ততঃ শ্রীবাসেন মনসি সন্দিহানেন ভগবদ্বচ ইতি
বিহিতনিশ্চয়েনাপি গঙ্গাদাসনামা ভগবতঃ
পরমাপ্তো ভূসুরবরো দ্বারপালত্বেন ন্যয়োজি ।৩

শ্রীবাসের প্রতি মহাপ্রভুর আরও হুকুম হইল, "তোমাকে সাজিতে হইবে নারদ।"

শ্রীবাস, ভবতা নারদেন ভবিতব্যম্ ।৪

(১) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৩য় অঙ্ক। (২) ঐ, ঐ। (৩) ঐ, ঐ। (৪) ঐ, ঐ।

"আর শুক্লাম্বরকে সাজিতে হইবে তোমার স্নাতক।"

শুক্লাম্বরেণ তব স্নাতকেন ভাব্যম্ ॥১

"শ্রীরামাদি তোমার তিন সহোদর হইবেন গায়ক।"

গায়কাঃ শ্রীরামাদয়স্তব সহোদরাস্ত্রয়ঃ ॥ ২

আচার্যরত্ন এবং বিদ্যানিধি তাঁহার দ্বারাই নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

আচার্যরত্নবিদ্যানিধী চেতি দেবেনৈব নিয়োজিতাঃ।৩

ইঁহাদের ছাড়া আর কাহারও সেখানে প্রবেশের অধিকার রহিল না। কিন্তু শ্রীবাস ও তাঁহার সহোদরদের বধূগণকে ও আচার্যরত্ন মুরারি প্রভৃতির বধূগণকে আগেই অভিনয়স্থলে প্রবেশ করাইয়া বসান হইয়াছিল। তাঁহারা এই রসের রসিক, তাই তাঁহাদের এই অভিনয়লীলা-রসাস্বাদনের অধিকার-বিষয়ে সন্দেহ করিবে কে?

অতঃপরং ন কেষামপি তত্র প্রবেশঃ। কিন্তু শ্রীবাসাদি-
সহোদরবধূভিঃ সহাচার্যরত্নমুরারিবধূপ্রভৃতয়ঃ প্রাগেব
তত্র প্রবিশ্য স্থিতা অধিকারভাজশ্চ তাঃ ॥

কাজেই দেখা যায়, মেয়েদেরও কেহ কেহ রসজ্ঞ সামাজিকরূপে সেই মণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর এই অভিনয়ের সজ্জা ও নৈপুণ্য কেমন ছিল তাহা চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের তৃতীয় অঙ্কেই সুন্দর বর্ণিত আছে।

ভক্তপ্রেমদাস বাংলাভাষায় যে অনুবাদ করেন তাহা হইতেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করিতেছি—

মৈত্রী কহে সে নৃত্য হৈব কার ঘরে।
ভক্তি কহে শ্রীআচার্যরত্নের মন্দিরে ॥
মৈত্রী কহে যদি তেঁহ হেন সর্বেশ্বর।
স্ত্রীভাবে তাঁহার নৃত্য বুঝিতে দুষ্কর ॥

(১) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, তৃতীয় অঙ্ক। (২) ঐ, ঐ। (৩) ঐ, ঐ।

প্রেম বলে বালা তুমি জ্ঞান নাহি হয়।
যে হন ঈশ্বর তিঁহ সর্বরসাশ্রয়॥
সর্বোত্তম সেই লীলা অনুকৃতি করি।
আজি নৃত্য করিবেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥১

...

পরম রহস্য তাহা অন্য নাহি পারে॥
এই ভাবি রাধারূপ ধরিল আপনে।

...

অদ্বৈতেরে করিলেন শ্রীকৃষ্ণের বেশ।

...

আর শুন হরিদাস হৈল সূত্রধার।
শ্রীমুকুন্দ পারিপার্শ্বিক হইলা তাঁহার॥
বাসুদেবাচার্য হৈল বেশ-সম্পাদক।
নিত্যানন্দ শুন হৈলা যে লীলাকারক॥

...

যোগমায়া ভগবতী বৃন্দারূপ ধরে।২

মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,

শ্রীবাসের প্রতি কহিলেন কৃপাবান॥
শুন শুন শ্রীনিবাস আমার বচন।
নৃত্যকালে হবে আজি সাবধান মন॥
এ কর্মের যোগ্য যে তাহারে যাইতে দিবে।
অন্য জন যাইবারে নিষেধ করিবে॥

...

প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিবাস মতিমান।
দ্বারপাল রাখিলা হইয়া সাবধান॥
প্রভুর পরম পাত্র গঙ্গাদাস বিপ্র।
শ্রীনিবাস তারে দ্বারী করিলেন ক্ষিপ্র॥৩

---

(১) প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৩য় অঙ্ক, পৃ. ৩৭-৩৮। (২) ঐ, পৃ. ৩৮ (৩) ঐ।

ভগবান শ্রীবাসেরে কহিলেন পুনঃ।
নারদ হইবে তুমি মোর বোল শুন॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তোমার স্নাতক।
এবে শুন যে-যে জন হইব গায়ক॥
শ্রীরামাদি তোমার যে তিন সহোদর।
আচার্যরত্ন বিদ্যানিধি পঞ্চ সাধুবর॥
ইহা বহি অন্য প্রবেশিতে নাহি দিবে।
পরম রহস্যলীলা আজি সে হইবে॥
ইহা শুনি শ্রীআচার্যরত্নের দুহিতা।
মুরারির বধূ আদি যত পতিব্রতা॥
শ্রীবাসের সহোদর-পত্নীর সহিতে।
আগে গিয়া নৃত্যস্থলে রহিল একভিতে॥
সে লীলা দেখিতে তাঁরা হন অধিকারী।
তেঞি আগে শ্রদ্ধা করি গেল অনুসরী॥১

...

রাধাবেশে গৌরচন্দ্র আসি প্রবেশিলা॥
বিশ্বম্ভর বলি কেহ চিনিতে না পারে।
আকৃতি প্রকৃতি রাধা সভে মনে করে॥২

প্রভুর প্রিয় গদাধর সখী-ললিতার অভিনয় করেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত,

সাক্ষাৎ ললিতা ইহোঁ নহে গদাধর।৩

শ্রীমন্ নিত্যানন্দের অভিনয় দেখিয়া মনে হইত,

নিত্যানন্দ নহে, ইহা জরতীর খেলা।৪

এই সব অভিনয়ে মহাপ্রভু প্রভৃতি নটগণও এমন অভিভূত হইয়া

(১) প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়, পৃ. ৩৮। (২) ঐ পৃ. ৪৬। (৩) ঐ পৃ. ৪৭ (৪) ঐ, ঐ।

উঠিতেন যে মনে হইত তাঁহারা একাধারে নট হইয়া অভিনয় করিতেছেন এবং সামাজিক হইয়া নাটকের রসও সম্ভোগ করিতেছেন। কাজেই এইসব অভিনয়স্থলে নট ও সামাজিকদের যে চিরপ্রচলিত প্রভেদ আছে তাহা আর থাকিত না। ভাবরসে অনুপ্রাণিত মহাপ্রভু প্রভৃতি ভুলিয়াই যাইতেন যে তাঁহারা অভিনয়মাত্র করিতেছেন। কবি-কর্ণপূর এই লীলারও একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন—

"রসজ্ঞ কৃতিগণ ভাল করিয়াই জানেন যে অভিনয়কালে সাধারণত সামাজিকেরাই অর্থাৎ দর্শকেরাই অভিনয়-রসের দ্বারা আবিষ্ট হন। নটদের তো আবিষ্ট হইবার কথা নয়। কিন্তু অলৌকিক এইসব অভিনয়লীলায় এইরূপ কোনো প্রভেদই টিঁকিতে পারিত না। কাজেই এখানে অভিনেতারা সামাজিক ও নট দুই ভাবেরই ভাবুক হইয়া ভাবামৃতরসে অভিভূত হইয়া পড়িতেন।"

সামাজিকানাং হি রসো নটানাং
নৈবেতি পন্থাঃ কৃতিষু প্রসিদ্ধঃ।
হন্তোভয়ত্বে রসবিত্ত্বমেষা-
মলৌকিকে বস্তুনি কো বিরোধঃ ॥১

(১) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৩য় অঙ্ক।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	৫	করেছিলেন।"	করেছিলেন।
১৪	৯	স্থান।	স্থান।"
২৬	১৭	ঝুঠ	ঝঠ
৪৬	২৪	শেষে	শিষ্যা
৪৮	১৬	বিশ্বনাকৃত	বিশ্বনাথকৃত
৫৫	১	শ্রীমাধব,	শ্রী, মাধব,
৬১	৩	ত্বন্মার্তিঃ	তন্মূর্তিঃ
৭৫	১০	কলয়ন	কলয়ন্

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচায
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫ বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬ রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

